পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

Patient Care Technique-1

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৮৯১১

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. নুরে মোজাম্মেল কিরণ

নিগার সুলতানা

ডা. আইরিন বিনতে আজাদ

ডা. এম মুস্তাজিব হায়দার

মো: আসলাম পারভেজ

মো: শাওন কবির সিকদার

মো: আমানউল্লাহ্

মুহ: আবদুর রাজ্জাক মিঞা (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : **নভেম্বর**, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর ক া যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

প্রথম অধ্যায়

পেশেন্ট কেয়ারে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা

Health Safety in Patient Care



কর্মক্ষেত্রে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ের জন্যই পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য হচ্ছে রোগীর সেবাদানের একটি মূল ভিত্তি। স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, সহিংসতা এবং হয়রানি থেকে মুক্ত থাকতে কর্মক্ষেত্রে যেসব ক্ষতিকর ও ঝুঁকির উপাদান রয়েছে সেগুলো অপসারণ, হ্রাস বা প্রতিস্থাপন করাই হল একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের পূর্ব শর্ত। এটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রোগীর সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীরা শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি আইন ও বিধি আকারে বাংলাদেশ শ্রম আইন নামে ২০০৬ সালে প্রণয়ন করে পরবর্তীতে যথাক্রমে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সংশোধিত শ্রম আইন হিসেবে জারি করা হয়েছে। পেশাগত এইসব স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে রোগী ও কর্মক্ষেত্রে অর্পিত কাজগুলো সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারব।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কী তা বর্ণনা করতে পারব।
- OSH নীতি এবং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা অনুশীলনের দক্ষতা অর্জন করতে পারব।
- কর্মস্থলে হ্যাজার্ড বা আপদ শনাক্ত করতে পারব।
- সুরক্ষা লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
- নসোকোমিয়াল ইনফেকশন বর্ণনা করতে পারব।
- দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া ও রিপোর্টিং করতে পারব।
- হাসপাতালে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/ পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন ও কালার কোড সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো এবং কর্মক্ষেত্রে ধোঁয়া থেকে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ কৌশল অর্জন এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার পদ্ধতি নিশ্চিত করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব ।

১.১ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলতে সাধারণ কিছু কর্যক্রমকে বোঝায় যার মধ্যে রয়েছে গ্লাভস পরা, চোখের সুরক্ষা পরা, ভালো সরঞ্জাম ব্যবহার করা, কোনো কিছু ছিটকে পড়লে তা পরিষ্কার করা, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট ব্যবহার করতে পারা ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে যে, এগুলো জানার মধ্যেই শুধু সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে আরও কিছু বিষয় জড়িত।

১.১.১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সুবিধা

যখন এক দল কর্মীবাহিনী সত্যিকার অর্থে কাজে নিবেদিত হয় এবং একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরির লক্ষে একত্রিত হয়, তখন এটি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের আঘাত হ্রাস এবং অসুস্থতা নিরসনে অবদান রাখা এবং অগণিত সুবিধা প্রদান করে থাকে।

১.১.২ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় করণীয়

একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করার জন্য সমস্ত কর্মচারীদের দ্বারা অনুসরণ করা যেতে পারে এমন কিছু নিরাপত্তামূলক করণীয় রয়েছে। যদিও নিম্নের বিষয়গুলোই একমাত্র করণীয় নয়; বরং সেবাদানকারীরা যাতে তাদের কর্মক্ষেত্রে কম ঝুঁকিতে কাজ করতে পারে তার মধ্যে এগুলোই মূল মৌলিক আদর্শগুলোর অন্যতম। যেমন:

১। সর্বদা অনিরাপদ অবস্থার রিপোর্ট করা : কখনও কখনও, কর্মীরা নিজের বা অন্য কেউ সমস্যায় পড়ার ভয়ে তাদের উর্ধ্বতনদের সাথে নির্দিষ্ট ঝুঁকির বিষয় এবং বিপদগুলো জানাতে দ্বিধা বোধ করতে পারে। এটি নিরাপদ কাজের পরিবেশের জন্য অনুকূল নয়। কারণ এটি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা আঘাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই কর্মীকে অন্যান্য সহকর্মীদের এবং নিজেদের রক্ষায় সাহায্য করার জন্য অবিলম্বে ঝুঁকির বিষয়গুলো রিপোর্ট করতে হবে। একবার এই সমস্যা চিহ্নিত হয়ে গেলে, দ্রুত এবং কার্যকরভাবে পরবর্তী ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

২। ওয়ার্কস্টেশন বা কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা: সেবাদানকারীরা তাদের ওয়ার্কস্টেশনের কাছাকাছি অপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকলে অথবা ওয়ার্কস্টেশনে কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা অবশ্যই সর্বদা পরিষ্কার করবে এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে মিলে কাজ করা লাগলে সেই এলাকাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্যানিটাইজ করতে হবে।



চিত্র ১.১: অনিরাপদ অবস্থার রিপোর্ট করা



চিত্র ১.২: ওয়ার্কস্টেশন পরিষ্কার রাখা

৩। প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধান করা: কাজের সময় কর্মীদের সর্বদা প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধান করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শই কর্মীরা নির্দিষ্ট পিপিই পরতে ভুলে যান, যেমন প্রতিরক্ষামূলক গগলস, হেয়ার নেট ইত্যাদি। কারণ তারা মনে করে যে,এটি ছাড়াই তারা দ্রুত কাজটি শেষ করতে পারবে। কর্মীদের নিরাপদ রাখতে এবং তাদের আঘাত বা অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত

সুরক্ষামুলক সরঞ্জামগুলো দেওয়া হয়; তাই সর্বদা তাদের কাজের জন্য নির্ধারিত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) যথাযথভাবে পড়ে নিতে হবে।

৪। কাজের ফাঁকে বিরতি নেয়াঃ কর্মস্থলে দায়বদ্ধতার এবং অতিরিক্ত কাজ করার কারণে কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই কিছু কিছু কাজ শেষ করার আগে কর্মীদের বিশ্রাম নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজে ফেরার জন্য মাঝে মাঝে বিরতি নেয়া উচিত। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হলে কর্মীরা একটি ঝুঁকির মধ্যে পড়েন এবং হাতের কাজটিতে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারে না; এর ফলে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৫। ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো এড়িয়ে না যাওয়া: কখনও কখনও কর্মীরা একটি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করে । এতে তাদের কাজের ধারাবাহিকতার বিচ্যুতি ঘটে। এসময় দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সঠিক উপায়ে কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার ভুলে যেতে পারে। এটি যে কোনো মুল্যে এড়ানো উচিত।

৬। নতুন কর্ম পদ্ধতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল (Up-to-Date) থাকা: কর্মক্ষেত্রে কোনো নতুন পদ্ধতি বা নতুন সরঞ্জামাদি যুক্ত হলে কর্মীদের সেই ব্যাপারে সর্বদা সচেতন এবং ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে কর্মীদের কী করা দরকার সে সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। কোনো প্রশ্ন বা কিছু জানার থাকলে সুপারভাইজারকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে।

৭। সঠিক দেহ ভঙ্গি (Body Posture) বজায় রাখা: সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় রেখে কাজগুলো সম্পাদন করা কর্মীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারি জিনিস তোলা, এমনকি কম্পিউটারে বসে কাজ করার ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তার উপদেশগুলো মেনে চলা উচিত। সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় রেখে কাজ করলে ঘাড়, পিঠ বা কাঁধে ব্যথাসহ সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।

৮। নতুন কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করা: প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উচিত নতুন কর্মীদের সঠিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার নির্দেশনা দেওয়া। উক্ত সংস্থার নিরাপত্তা নিয়ম এবং এর মানদণ্ড সম্পর্কে অবহিত করলে কর্মস্থলের নিরাপত্তার ভীত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

১.২ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

১.২.১ পেশাগত স্বাস্থ্য (Occupational Health)

পেশাগত স্বাস্থ্য হল কাজের একটি ক্ষেত্র যেখানে সকল পেশার কর্মীদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার উন্নয়ন ও মান বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা করে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) হল জনস্বাস্থ্যের একটি শাখা যেখানে কর্মীদের অসুস্থতার প্রবনতা এবং ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করে এবং সেগুলো প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়।

১.২.২ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিধান

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৯ (২ নং আইন): পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৯ দ্রষ্টব্য।

১.২.৩ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

বেশিরভাগ কর্মী কর্মক্ষেত্রে দিনে কমপক্ষে আট ঘণ্টা ব্যয় করে, তা হোক কোনো হাসপাতালে রোগীর কাছে, অফিসে কিংবা কারখানায়। তাই কাজের পরিবেশ নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত। সারা বিশ্বে প্রতিদিন কর্মীরা প্রচুর স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, যেমন: ধুলা, গ্যাস, প্রকট শব্দ, কম্পন; চরম তাপমাত্রা ইত্যাদি। অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি (OSH) বা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রাথমিকভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, আঘাত এবং ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শ থেকে কর্মীদের রক্ষা করার উপর আলোকপাত করে। যদিও দুর্ঘটনা

যেকোনো সময় ঘটতে পারে, তবুও নিয়োগকর্তার দায়িত্ব নিশ্চিত করা উচিত যেন দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নেয় এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখা। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন:

১। এটি কর্মক্ষেত্রে আঘাত এবং অসুস্থতা হ্রাস করে
২। এটি কর্মীদের উৎপাদনশীলতা উন্নত করে
৩। এটি কর্মীদের অনেকদিন একই জায়গায় ধরে রাখতে সাহায্য করে
৪। এটি আঘাতের খরচ এবং শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ হ্রাস করে


চিত্র ১.৩: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

১.৩ স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব

স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং এর পরিষেবা, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা, রোগ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবং জ্ঞানকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বলে। স্বাস্থ্য সচেতনতা হল রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত সনাক্তকরণ, সঠিক চিকিৎসা ও থেরাপীর জন্য অপরিহার্য এবং কার্যকর স্বাস্থ্য সেবার মূল চাবিকাঠি। একটি রোগ এবং এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, হেলথ স্ক্রীনিং করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ চেক-আপের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়। আমাদের দেশে রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বা স্ক্রীনিং এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা গ্রহণে অবহেলা সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুতর বাধা।

১.৪ স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) নীতি এবং পদ্ধতি

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা একই সূত্রে গাঁথা হলেও এর প্রকৃতি এবং কার্যক্রম অনেকটা ভিন্ন। তাই এই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালাটি দুইটি পর্বে উপস্থাপন করা হল:

ক) প্রথম পর্ব- স্বাস্থ্য নীতিমালা; এবং **খ) দ্বিতীয় পর্ব**-নিরাপত্তা নীতিমালা।

১.৪.১ স্বাস্থ্য নীতিমালা

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩ইং) এর ধারা ৫১ থেকে ৬০ দ্রষ্টব্য।

১.৪.২ নিরাপত্তা নীতিমালা

নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত যন্ত্রপাতি এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটি অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়; এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো করণীয় বলে গণ্য করতে হবে। যেমন-

১। অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা: অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কারখানায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা আছে যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে হবে।
২। বিভাগ অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE)- এর ব্যবহার যেমন: কেমিক্যাল বিভাগ এর জন্য রাবার এপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, কেমিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস ও গামবুট।
৩। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি: সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপদভাবে করতে হবে। কোথাও কোনো খোলা তার, ইনসুলিশন টেপযুক্ত তার থাকবে না।
৪। বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা।
৫। বিভিন্ন স্টোর: প্রতিদিন কাজ শুরুর পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
৬। ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তা।
৭। চলমান যন্ত্রপাতিতে বা উহার নিকট কাজ করা (বিধি-৫৭)।

১.৫ ব্যক্তিগত সুরক্ষার অনুশীলন

সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ কৌশল ও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কারণ এই সুরক্ষার মাধ্যমে শুধু নিজেকে নয় এর পাশাপাশি রোগী, সহকর্মী এবং সাধারণ জনগণকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

১.৫.১ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বা পি পি ই (PPE)

অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ এর ভাষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষামুলক সরঞ্জাম বলতে "সংক্রামক পদার্থের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য একজন কর্মী দ্বারা পরিধান করা বিশেষ পোশাক বা সরঞ্জাম" কে বুঝায়। সরঞ্জামটি কেবল সেবা কর্মীদেরই সুস্থ রাখা না, এটি রোগীদের সংক্রমণের কবল থেকেও রক্ষা করে। PPE পরিধানকারী এবং একটি দূষিত পরিবেশের মধ্যে এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা তৈরি করে এবং রোগের বিস্তার রোধ করে। এই বাধার ফলে বিভিন্ন ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াকে নাক, চোখ এবং মুখের পাশাপাশি ত্বকে অবস্থিত শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে সংক্রমিত করতে বাধা দেয়। PPE সাধারণত হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারের চেম্বার এবং গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।

১.৫.২ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কতিপয় সাধারণ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার ব্যবহার করেন। এর মধ্যে রয়েছে মাস্ক, গ্লাভস, চোখের সুরক্ষা এবং পোশাক। যেমন:গাউন, হেড কভারিং এবং জুতার কভার।

ক। মাস্ক: মাস্ক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস থেকে নাক ও মুখকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের মাস্ক পাওয়া যায় যেমন; কাপড়, N৯৫ এবং সার্জিক্যাল মাস্ক যা বিভিন্ন স্তরের সুরক্ষা প্রদান করে থাকে।

খ। গ্লাভস: দূষিত পৃষ্ঠ বা সংক্রামক রোগীদের থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের রক্ষা করার জন্য গ্লাভস গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা সরঞ্জাম। তাছাড়া, গ্লাভস পরা কর্মীরা রোগীদের ক্ষতকে সংক্রমিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সামগ্রিকভাবে, গ্লাভস রোগী এবংকর্মী উভয়ের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা প্রদান করে।

গ। চোখের সুরক্ষা: এটা পরতে হয় তখন, যখন পরিবেশে রক্ত বা অন্যান্য শারীরিক তরলের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের যত্ন নেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য চোখের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভাইরাসটি চোখের মধ্যে থাকা যে কোনোও শ্লেষ্মা ঝিল্লির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

ঘ। প্রতিরক্ষামূলক পোশাক: গাউন, ফেইস শিল্ড এবং জুতার কভার ত্বক এবং পোশাককে শারীরিক তরলের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করে।



চিত্র ১.৪: বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরনজাম

১.৬ কর্মস্থলে আপদ (হ্যাজার্ড) শনাক্তকরণ

১.৬.১ আপদ বা হ্যাজার্ড:

খুব সহজভাবে বলা যায় যে, যার মাধ্যমে জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ বা পরিবেশের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে সেটিই হল আপদ । যেমন: আগুন, বিদ্যুৎ, এসিড ইত্যাদি আমাদের উপকারে ব্যবহার হলেও হঠাৎ করে জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ বা পরিবেশের ক্ষতি করে বসতে পারে। তাই এদেরকে আপদ বা হ্যাজার্ড বলা হয়। অতএব হ্যাজার্ড হলো, যখন কোনো কিছু বা কোনো বিষয় কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে বা ক্ষতির কারণ হয়। কোনো বিষয় কোনো সম্পদের/পরিবেশের ক্ষতি করে বা ক্ষতির কারণ হয়। উভয় আপদই ঘটতে পারে।

১.৬.২ কর্মক্ষেত্রে প্রধান প্রধান আপদ

কর্মক্ষেত্রসহ সকল জায়গায় মোটামুটিভাবে ৭ প্রকার আপদ লক্ষ্য করা যায়। যথা:

ক) বস্তুগত বা ফিজিক্যাল আপদ- বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট জড় বস্তু যেমন: ইট, পাথর, বালি, পেরেক, লৌহ খন্ডসহ যে কোনো কিছুই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই এগুলোকে বস্তুগত বা ফিজিক্যাল আপদ বলে।

খ) রাসায়নিক আপদ- যেকোনো রাসায়নিক পদার্থ বা রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন: এসিড, পেট্রোল, থিনার, আগুন- এ সকল কিছুই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে ।

গ) অনুজীব ও জীবাণু আপদ- নোংরা স্থান ও বাসি পচা খাবারে বসবাসকারি অনুজীব যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা, এন্টামিবা, ভাইরাস এ সব কিছু মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে বিধায় এটি আপদ হিসাবে বিবেচিত। বিভিন্ন রোগ যেমন: ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তি তার কফ, হাঁচি, থুথু যেখানে সেখানে ফেললে রোগের জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পাশে বসা কোনো সুস্থ মানুষের নাক বা মুখ দিয়ে এ জীবাণু শরীরে প্রবেশের ফলে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। এ জীবাণুগুলো কোনো পৃষ্ঠের উপর যেমন: টেবিল, দরজার লক, যন্ত্রপাতির হাতল, টাকা প্রভৃতির উপর ২ ঘন্টা বা তার বেশি সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। তাই রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি হাত দিয়ে তার নাক পরিষ্কার করে অথবা মুখে হাত দিয়ে হাঁচি ফেলে সেই হাতে যা স্পর্শ করবে তাতেই জীবাণু লেগে যাবে এবং সুস্থ শরীরে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটবে।



চিত্র ১.৫: রাসায়নীক আপদ



চিত্র ১.৬: বায়োলজিক্যাল বা জীবানু আপদ-এর সাইন

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক আপদ-মানসিক চাপ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বিধায় মানসিক চাপ মনস্তাত্ত্বিক আপদ। প্রচন্ড কাজের চাপ, পারিবারিক অশান্তি বা পীড়নদায়ক পরিবেশ প্রভৃতি কারণে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

ঙ) বিকির্ণ রশ্মি বা রেডিয়েশন আপদ- ওয়েল্ডিং মেশিন থেকে এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয় যা চোখের সাময়িক ক্ষতিসহ স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। ইহা বিকির্ণ রশ্মি বা রেডিয়েশন আপদের উদাহরণ।

চ) নয়েজ ও ভাইব্রেশন আপদ- বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, শীটমেটাল ওয়ার্কশপ এবং কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও মেশিন থেকে প্রচন্ড শব্দ নির্গত হয়। এ শব্দ মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং শ্রবণ শক্তিকে লোপ

করতে পারে। আবার মনুষ্য সৃষ্ট গোলমাল হৈ চৈ হঠাৎ কোনো কর্মীকে অমনোযোগী করতে পারে যা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ছ) আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড: যখন শরীরের মাংশপেশী একই ধরনের টান পায় কিন্তু তা পূরণ হওয়ার মত সময় পায়না তখন সে স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যে পরিস্থিতি এমনটা তৈরি করে তাই আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড। যেমন, সারাক্ষণ একইভাবে একই অবস্থানে কাজ করা। এই একই অবস্থানে কাজ করার দরুণ শরীরের মাংসপেশী ও হাড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়;তাই এটি আর্গোনোমোকি হ্যাজার্ড। এই হ্যাজার্ডের ফলে মাংসপেশী, হাড়, রক্তনালী, স্নায়ু ও অন্যান্য টিস্যুতে আঘাত ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং এ ক্ষতের কারণে ব্যথা হয়,এমনকি স্থায়ীভাবে পঙ্গুও হতে পারে।



চিত্র ১.৭: আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড

জ) যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক আপদ: বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীর ঘূর্ণায়মান অংশের মাধ্যমে কর্মী আহত হতে পারে। তাই এগুলো আপদ। আবার বিদ্যুৎ একটি আপদ। কারণ বৈদ্যুতিক শক পেলে মানুষ আহত কিংবা মারা পর্যন্ত যেতে পারে।

১.৬.৩ আপদ নিয়ন্ত্রণ

আপদ নিয়ন্ত্রণ বলতে বিভিন্ন বস্তুগত বা ফিজিক্যাল, রাসায়নিক, জীবাণু, মনস্তাত্বিক, রেডিয়েশন, শব্দ দূষন অথবা ভূকম্পন আপদ যেন দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্ঘটনা ঘটলেও কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থাকে বুঝায়।

১.৬.৪ কর্মক্ষেত্রে আপদ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রধান উপায়

আপদ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রধান উপায়গুলো নিম্নরূপ-

১। আপদকে কর্মস্থল থেকে দূর করা। ২। আপদকে নিরাপদ বস্তু বা কৌশল দ্বারা প্রতিস্থাপন। ৩। প্রকৌশলগত ব্যবস্থা- প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, ভেন্টিলেশন পদ্ধতি অথবা কার্য প্রক্রিয়ার এমনভাবে পরিবর্তন ঘটানো যাতে করে দুর্ঘটনা হ্রাস পায়। ৪। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ- শ্রমিক কর্মীদের শ্রম ঘণ্টা পরিবর্তন, কাজের নীতি, কলা কৌশল ও অন্যান্য নিয়ম কানুন । ৫। কর্মীদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা।	 চিত্র ১.৮: কর্মক্ষেত্রে আপদ নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিক স্তর

১.৭ কর্মক্ষেত্রের নিরাপদ ও অনিরাপদ কার্যাভ্যাস

কর্মীদের যেকোনো পেশা বা প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে, একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করতে অবশ্যই যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকতে হবে। এটি সাধারণ শোনালেও কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ই বারবার ভুল করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনিরাপদ কাজের পরিস্থিতি একটি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে যা গুরুতর আঘাত বা এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

১.৭.১ অনিরাপদ কাজের অভ্যাস

১। প্রশিক্ষণের অভাব, প্রশিক্ষণ বা অনুমোদন ছাড়া সরঞ্জামাদি অপারেটিং করা
২। যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষামুলক সরঞ্জামের অভাব
৩। ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম ব্যবহার করা, যেমন পাওয়ার টুল বা মই
৪। সেফটি হ্যাজার্ড সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করতে ব্যর্থতা
৫। অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে সরঞ্জাম পরিচালনা, অনুপযুক্ত ওয়ার্কস্টেশন বিন্যাস
৬। অগোছালো হাউস কিপিং, অপর্যাপ্ত আলোতে কাজ করা
৭। আগুনের বিপদ, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা সতর্কতা ব্যবস্থা
৮। একক ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ, নিরাপত্তা চিহ্ন উপেক্ষা করা।

১.৭.২ নিরাপদ কাজের অভ্যাস

নিম্নে কতগুলো নিরাপদ কাজের অভ্যাস উল্লেখ করা হল:

১। কর্মীদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া; নিরাপদ আচরণের জন্য কর্মীদের পুরস্কৃত করা
২। পেশাগত চিকিৎসকদের নিয়োগ দেওয়া
৩। সেফটি লেবেল এবং চিহ্ন ব্যবহার করা; জিনিস পরিষ্কার ও গুছিয়ে রাখা
৪। নিশ্চিত করা যে কর্মীদের সঠিক সরঞ্জাম আছে এবং এর কার্যকারীতা পরীক্ষা করা হয়েছে
৫। কাজের মধ্যে বিরতিকে উৎসাহিত করা; কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে নিয়মিত মিটিং করা।
৬। কাজের শুরু থেকেই নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রয়োগ করা
৭। স্টাফ এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সংলাপ রাখার ব্যবস্থা রাখা ।

১.৭.৩ নিরাপদ অপারেটিং পদ্ধতি

নিরাপদ অপারেটিং পদ্ধতি (এসওপি) হল একটি সংস্থার দ্বারা সংকলিত ধাপে ধাপে নির্দেশাবলির একটি সেট যা কর্মীদের জটিল রুটিন কাজ-কর্ম পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

১.৭.৪ জরুরি বহির্গমন

যেকোনো জরুরি অবস্থায় ভবন থেকে নিরাপদে বের হতে যে রাস্তা বা পথ ব্যবহার করা হয় তাকে বহির্গমন পথ বা এক্সিট রুট বলে। প্রয়োজন অনুসারে একটি ভবনের প্রতিটি কক্ষের এক বা একাধিক এক্সিট রুট থাকতে পারে।

বহির্গমন পথের বিধিমালাসমূহ

১। ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরে সহজে দৃশ্যমান এক বা একাধিক স্থানে বহির্গমন পথের নকশা দেওয়ালে টানিয়ে রাখতে হব; তিন বা তার চেয়ে কম তলা ভবনের জন্য বহির্গমন পথ সর্বনিম্ন ১ঘন্টা অগ্নি প্রতিরোধক হতে হবে,
২। চার তলা বা তার চেয়ে বেশী তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য এ পথ সর্বনিম্ন ২ঘন্টা অগ্নি প্রতিরোধক হতে হবে।
৩। ভবনের প্রতিটি কক্ষ যেখানে ২০ জন বা তার অধিক লোক কাজ করে সেখানে ন্যূনতম ২টি বহির্গমন পথ থাকতে হবে।
৪। বহির্গমন পথ কোনো ব্যক্তির কাজের স্থান থেকে ৫০মিটারের অধিক দূরত্বে হবে না।

৫। বহির্গমন পথের প্রস্থ ১.১৫ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটারের কম হতে পারবে না; ভবনের মাঝের বহির্গমন সিঁড়িপথ ও বাঁকের শেষ প্রান্ত ভবনের বহিমুর্খী হতে হবে।
৬। বহির্গমন পথের দেওয়াল, ফ্লোর ও সিলিং অগ্নি প্রতিরোধক নির্মাণ দ্বারা তৈরি হতে হবে; বহির্গমন ছাড়া অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না।
৭। বহির্গমন পথ বাঁধা মুক্ত থাকতে হবে এবং এ পথের ধারণক্ষমতা কমানো যাবে না।
৮। উক্ত দরজা কখনো তালাবদ্ধ করা যাবে না; বহির্গমনের প্রত্যেক দরজা সুইংগিং ফায়ার ডোর হতে হবে।

বহির্গমন সংকেত বা এক্সিট সাইন

বহির্গমন সংকেত বা এক্সিট সাইন হলো আলোযুক্ত এমন এক প্রকার সংকেত বা চিহ্ন যা সঠিকভাবে, দ্রুত ও নিরাপদে দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান থেকে নিরাপদ স্থানে আসতে সাহায্য করে। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।বর্তমান সময়ে সকল ভবনে এক্সিট সাইন বা প্রস্থানের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আলোযুক্ত বহির্গমন সংকেত এ ব্যাটারি ব্যাকআপ ও ইমারজ্যান্সি পাওয়ারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটি বহির্গমন পথের সামনে রাখতে হবে। যে সকল স্থান থেকে বহির্গমন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না সেখানে অতিরিক্ত এক্সিট সাইন ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে পথ নির্দেশক সাইন থাকতে হবে।

১.৭.৫ অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম

১। ফায়ার এক্সটিংগুইসার
২। ভাল্ব ও রাইসার
৩। হোস ও আনুষঙ্গিক উপকরণ
৪। আগুন হাইড্র্যান্ট
৫। রিল এবং ক্যাবিনেট

ভবনে



চিত্র ১.১০: একটি অগ্নি নির্বাপক

ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার সহজে মনে রাখার উপায়: (PASS)



চিত্র ১.১১: ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার সহজে মনে রাখার উপায়

ট্যাগিং: ট্যাগিং হল এমন একটি পদ্ধতি যা পেশাদারী কর্মীরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দৃশ্যত পরিদর্শন করার পাশাপাশি লেবেলিং করে কাজের উপযুক্ত করেরাখে। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নিয়মানুসারে সমস্ত যন্ত্রপাতি কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষম করে রাখার জন্য ট্যাগিং অপরিহার্য। কর্মচারী বা দর্শনার্থীদের ক্ষতি করতে পারে এমন কোনো বিপদ আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন অবশ্যই করণীয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ট্যাগিং করলে সরঞ্জামগুলোর সমস্যা শনাক্ত করা যায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার এটি একটি ভালো অভ্যাস। এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণও করা হয় এবং ক্ষতির হাত থেকেও যন্ত্রটিকে রক্ষা করা যায়। যন্ত্রপাতির ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন এবং মেরামত করাও অপরিহার্য। ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলোর আপডেট রেখে ট্যাগিং পদ্ধতি চলমান রাখা নিরাপদ ও ঝুঁকির হাত থেকে কর্মীকে কাজে স্বাচ্ছন্দ এনে দেয়।

১.৮ নসোকোমিয়াল ইনফেকশন

নসোকোমিয়াল ইনফেকশন হল এমন একটি সংক্রমণ যখন একজন স্বাস্থ্যকর্মী বা রোগী বা স্বজনরা কোনো কারণে হাসপাতালে অবস্থান করার সময় সংক্রমিত হয়। একে হাসপাতাল-অর্জিত সংক্রমণ (Hospital-Aquired Infection) বা স্বাস্থ্য-সেবা সম্পর্কিত সংক্রমণও বলা হয়। নসোকোমিয়াল সংক্রমণের কারণে জীবাণুগুলো হাসপাতালে প্রবেশের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যক্তিকে অসুস্থ করে তোলে।

১.৮.১ নোসোকোমিয়াল ইনফেকশনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের সাধারণ নোসোকোমিয়াল সংক্রমণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১। **ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ:** ব্যাকটেরিয়া হল ক্ষুদ্র জীবন্ত জিনিস যা দেখতে খুব ছোট। বেশিরভাগই ক্ষতিকারক নয়, তবে কিছু গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া নসোকোমিয়াল সংক্রমণের সবচেয়ে সাধারণ কারণ। সাধারণ ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে ই. কোলাই এবং স্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি।

২। **ছত্রাক সংক্রমণ:** ছত্রাক হল জীবন্ত জিনিস, যেমন মাশরুম, মোল্ড। কিছু ছত্রাক ক্ষতিকারক সংক্রামক কারণ হতে পারে। সবচেয়ে যে ছত্রাক নসোকোমিয়াল সংক্রমণ ঘটায় তা হল ক্যান্ডিডা (থ্রাশ) এবং অ্যাসপারগিলাস।

৩। **ভাইরাল সংক্রমণ:** ভাইরাস হল ক্ষুদ্র জীবাণু যা ব্যক্তির প্রাকৃতিক জেনেটিক কোড অনুকরণ করে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরে কৌশলে সেগুলোর কপি তৈরি করে, ঠিক যেমন শরীর অন্যান্য কোষের কপি তৈরি করে। ভাইরাস মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট সাধারণ নোসোকোমিয়াল সংক্রমণ হল ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু) এবং শ্বাসযন্ত্রের সিঙ্কশিয়াল ভাইরাস।

সুরক্ষা লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ

কর্মস্থলে সর্বদাই স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন: পাবলিক ভবন, নির্মাণ সাইট, অফিস, গুদামাগার,হাসপাতাল, প্রভৃতি। আমরা প্রতিদিন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার লক্ষণ বুঝার চেষ্টা করি। অনেক সময় এর আকৃতি-প্রকৃতি ও রঙ দেখেই অনুমান করা যায় এটা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। সাধারণত ৫ টি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা চিহ্ন রয়েছে এবং যেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১। **নিষেধাজ্ঞার চিহ্ন:** নিষেধাজ্ঞার চিহ্ন হল এক প্রকারের প্রতীক যা একটি কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ করে। এটির লক্ষ্য এমন একটি আচরণ প্রতিরোধ করা যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য নয়, এলাকা এবং এর অন্যান্য বাসিন্দাদের জন্যও সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এমন ধারণা সৃষ্টি করা। এটি কখনও কখনও নিষিদ্ধ কার্যকলাপের জন্য সরাসরি আদেশ হতে পারে। এর রঙ হয় লাল, আকার বৃত্তাকার।



চিত্র ১.১১: ক. নিষেধাজ্ঞার চিহ্ন; খ. বাধ্যতামূলক লক্ষণ; গ. সতর্ক সংকেত

২। **বাধ্যতামূলক লক্ষণ:** বাধ্যতামূলক চিহ্ন হল একটি প্রতীক যা একটি ব্যবসা বা শিল্পের সাথে জড়িত বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলো মেনে চলতে সাহায্য করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মের আদেশ দেয়। এর রঙ নীল ও আকার বৃত্তাকার।

৩। সতর্ক সংকেত: বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এই সতর্কতা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো আকৃতিতে ত্রিভুজাকার। পিকটোগ্রামটি একটি হলুদ পটভূমিতে কালো, ত্রিভুজটির একটি কালো সীমানা রয়েছে।
৪। নিরাপদ অবস্থার লক্ষণ: নিরাপদ অবস্থার লক্ষণগুলো বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গাকার। সবুজ পটভূমিতে চিত্রটি সাদা এবং প্রায়শই একটি সাদা সীমানা অংকিত থাকে।



চিত্র ১.১৩: নিরাপদ অবস্থার লক্ষণ

৫। অগ্নি সরঞ্জাম চিহ্ন: ফায়ার ইকুইপমেন্ট/ফাইটিং লক্ষণ দেখায় যে, ফায়ার ইকুইপমেন্টটি কোথায় আছে। আগুনের জন্য আমরা কি রঙ মনে করি? লাল। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ চিহ্নের জন্য লাল ব্যবহার করেছি। অয়েল, অগ্নি সরঞ্জাম চিহ্নও লাল, কিন্তু এটি একটি ভিন্ন আকৃতির।এই চিহ্নগুলো বর্গাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার। পিকটোগ্রামটি একটি লাল পটভূমিতে সাদা এবং একটি সাদা সীমানা থাকে।

১.৯ দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া ও রিপোর্টিং

দুর্ঘটনা রিপোর্টিং হল কর্মক্ষেত্রে কোনো ঘটনা রেকর্ড করার প্রক্রিয়া, যার মধ্যে থাকতে পারে কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া, আঘাত এবং দুর্ঘটনা ঘটা। এটি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করার পদ্ধতি। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠানে কোনো আক্রমণ চিহ্নিত করতে, অগ্রাধিকার দিতে, ধারণ করতে এবং নির্মূল করতে সাহায্য করে। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার লক্ষ্য হল সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ঘটনা সম্পর্কে সচেতন এবং সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং ভবিষ্যতে কোনো ঝুঁকি বা অনুরূপ ঘটনাগুলোকে রোধ করতে দ্রুত কাজ করে তা নিশ্চিত করে।

দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া পদ্ধতি

১। ঘটনাস্থলে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে জরুরি পরিষেবা নিশ্চিৎ করতে হবে।

৩। দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানকারী যদি যোগ্য হয় তবে অবিলম্বে কাজ শুরু করে অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতে হবে।

৪। সম্ভাব্য গৌণ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যান্য ব্যক্তির ভীড় সরাতে হবে।

৫। ঘটনাস্থলে মানুষ এবং অবস্থা শনাক্ত করে কেউ তার প্রকৃত ঘটনা জানে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে হবে। কেউ দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তির নাম জানে কিনা তা জানার চেষ্টা করতে হবে। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া ব্যক্তি ঘটনাস্থলে একা থাকলে তার চারপাশে তাকিয়ে সেখানে কে আছে তা লক্ষ্য করতে হবে।

৬। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার জায়গাটিতে নিরাপদ অবস্থার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্ঘটনার কারণ ও প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। তাৎক্ষনিক জরুরি অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে গেলে, এই অতিরিক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত:

ক। ক্ষতটি কতটা খারাপ, এটি কতটা খারাপ হতে পারে এবং অতিরিক্ত তদন্ত করার প্রয়োজন আছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে; খ। বিষয়টি যথাযথ কতৃপক্ষকে অর্থাৎ মালিক এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবার, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১.১০ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতিদিন আমরা নানা ধরনের কাজ করি এবং সেইসব কাজের জন্য বহুরকম জিনিস ব্যবহার করতে হয়। এরপর কাজের শেষে দেখা যায়, কিছু কিছু জিনিস আমাদের আর কাজে লাগে না। সেগুলো তখন অব্যবহারযোগ্য বা অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা ফেলে দিই। যেমন: খাবারের প্যাকেট, ভাঙাচোরা খেলনা, শিশি বোতল ভাঙা, কেটে যাওয়া বাল্ব ও টিউব লাইট, ময়লা কাগজ ইত্যাদি। এগুলো আমরা বর্জন করি বা ফেলে দিই। এগুলোই হল বর্জ্য পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে বাতিল সব পদার্থই বর্জ্য । অন্যভাবে বলা যায়, যে কোনো কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয় পদার্থ, যেগুলো আমাদের কোনো কাজে লাগে না অর্থাৎ ফেলে দেওয়া প্রয়োজন , সেগুলোই হল বর্জ্য পদার্থ। বাড়ির মতো কলকারখানা, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালতেও এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় জিনিস বা বর্জ্য পদার্থ বেরোয় এবং তার পরিমাণ অনেক বেশি। আর এগুলোই নোংরা বা আবর্জনা হয়ে বাড়ির আশেপাশে বা রাস্তার ধারে পড়ে থেকে পরিবেশকে দূষিত করে।

১.১০.১ বর্জ্যের প্রকারভেদ

ক। সাধারণভাবে বর্জ্য পদার্থসমূহকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায় —কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়।

১। **কঠিন বর্জ্য পদার্থ:** বর্জ্য পদার্থের মধ্যে কাচ, প্লাস্টিক, টিন, ব্যাটারি, কাগজ, নানারকম ধাতব জিনিস, ছাই, কাপড় বা ন্যাকড়া, টায়ার, টিউব প্রভৃতি কঠিন বর্জ্য পদার্থ।

২। **তরল বর্জ্য পদার্থ:** এগুলো গৃহস্থালি, কলকারখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি থেকে নির্গত হয়, যেমন- মল-মূত্র থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ, বাড়িঘর-কলকারখানা নিঃসৃত নোংরা জল, সাবান ও ডিটারজেন্ট মিশ্রিত জল ইত্যাদি।

৩। **গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ:** কলকারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস, যেমন: সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি।

খ। বিষক্রিয়ার ভিত্তিতে বর্জ্য পদার্থসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১। **বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ:** এগুলো কঠিন, তরল, গ্যাসীয় ও তেজস্ক্রিয় অর্থাৎ সবরকমই হতে পারে, যেমন: পারদ, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই, অব্যবহৃত কীটনাশক, ভাঙা কম্পিউটার সামগ্রী, ব্যাটারি, নাইট্রিক অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ। এগুলো মানুষ ও পশুপাখির জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

২। **বিষহীন বর্জ্য পদার্থ:** খাদ্যজাত বর্জ্য, কাচ, ধুলো, কংক্রীটের টুকরো, প্রভৃতি বিষহীন বর্জ্য পদার্থ।

১.১০.২ বর্জ্য পদার্থের উৎস

প্রধানত সাতটি উৎস থেকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয়। এগুলো হল:

১। **গৃহস্থালির বর্জ্য:** বাড়ির দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে যেসব বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলো এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন: শাকসবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্ট, মাছ-মাংসের ফেলে দেওয়া অংশ প্রভৃতি।

২। শিল্প বর্জ্য: কলকারখানা থেকে নির্গত কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, অর্ধতরল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থকে শিল্প বর্জ্য বলা হয়। যেমন: চামড়া কারখানার ক্রোমিয়াম যৌগ, আকরিক নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় নির্গত নানাপ্রকার ধাতু, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি।

৩। **কৃষিজ বর্জ্য:** কৃষিজাত দ্রব্য থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থকে কৃষিজ বর্জ্য নামে অভিহিত করা হয়। যেমন: আখের ছোবড়া, খড়, ধানের খোসা, নারকেলের ছোবড়া, প্রাণীজ বর্জ্য প্রভৃতি।

৪। **পৌরসভার বর্জ্য:** শহরের বা পৌর এলাকার বাড়ি, অফিস, বিদ্যালয়, বাজার, রেস্টুরেন্ট, হোটেল প্রভৃতিতে সৃষ্ট বর্জ্যকে পৌরসভার বর্জ্য বলে। এর মধ্যে থাকে শাকসবজির অবশিষ্টাংশ, কাগজ, কাপড়, ডাবের খোলা, প্লাস্টিক, ধাতব টুকরো প্রভৃতি।

৫। **জৈব বর্জ্য:** প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে যেসব বর্জ্য তৈরি হয়, সেগুলো জৈব বর্জ্য, যেমন-মাংস উৎপাদনকারী কারখানাগুলো থেকে নির্গত প্রাণীজ বর্জ্য, মাছের উচ্ছিষ্ট, ফুল-ফল-সবজি বাগানের বর্জ্য প্রভৃতি।

৬। **চিকিৎসা-সংক্রান্ত বর্জ্য:** বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা কেন্দ্রের আবর্জনা এই শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন: ক) অসংক্রামক বর্জ্য পদার্থ: যেমন ওষুধের ফয়েল, প্লাস্টিক থালা প্রভৃতি। খ) সংক্রমক বর্জ্য পদার্থ: সিরিঞ্জ, সুঁচ, কাঁচি, ব্লেড, তুলা , গজ, রক্ত, ব্যান্ডেজ, অপারেশন সংক্রান্ত আবর্জনা প্রভৃতি।

৭। **তেজস্ক্রিয় বর্জ্য:** পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য, যেমন ছাই, ভারী জল, চিকিৎসায় ব্যবহার্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি।

১.১০.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management)

বর্তমানে এটা প্রমানিত যে, বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করে। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, এইসব পদার্থকে জীবন থেকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং সবসময় চেষ্টা করা দরকার যে, কীভাবে এইসব পদার্থকে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক চক্রের একটি কার্যকরী উপাদান করে নেয়া যায়। এজন্য বর্জ্য পদার্থগুলোকে শুধুমাত্র অপসারণ বা স্থানান্তরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করে প্রয়োজন মতো এগুলোর পরিমাণ হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। আর এটাই হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management)। প্রকৃতপক্ষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হল এই তিনটি R যথা: Reduce (পরিমাণ হ্রাস), Reuse (পুনর্ব্যবহার) ও Recycle (পুনর্নবীকরণ)। অর্থাৎ এই তিনভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায় -

১। **বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce):** গৃহস্থালি, কলকারখানা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যাতে বেশি বর্জ্য তৈরি না হয়, তাই জিনিসের ব্যবহার কমানো, জিনিস অপচয় না করা, জীবনযাত্রার মান পালটে চাহিদাকে সীমিত রাখা, ব্যবহৃত জিনিস সরাসরি ফেলে না দিয়ে জমিয়ে রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

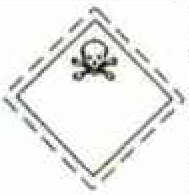
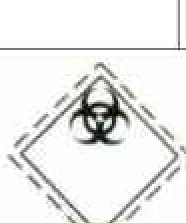
২। **পুনর্ব্যবহার (Reuse):** কোনো পরিবর্তন না করে বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করলে তাকে বলা হয় পুনর্ব্যবহার। যেমন—ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিস, লেখার সামগ্রী প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

৩। **পুনর্নবীকরণ (Recycle):** এই পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থকে পুনরায় প্রক্রিয়াকরণ বা পুনরাবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। এর ফলে একই দ্রব্য বা নতুন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। যেমন: লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীসমূহ ব্যবহারের ফলে অকেজো হয়ে গেলেও পুনরায় গলিয়ে নতুন নতুন লোহা-ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী প্রস্তুত করে ব্যবহার করা যায়।

১.১০.৪ হাসপাতলে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/ পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন ও কালার কোড

সাধারণ বর্জ্যের বিন- **সাংকেতিক চিহ্ন:** কালো রঙের বৃত্ত **পটভূমি:** কালো রঙের বর্ডারে সাদা রঙের		**ধারাল বর্জ্যের বিন-** **সাংকেতিক চিহ্ন:** লাল রঙের বৃত্তের ভিতরে সাদা রঙের দুটি হাড়ের উপর মাথার খুলি **পটভূমি:** লাল বর্ডারের উপর সাদা	
সংক্রামক বর্জ্যের বিন- **সাংকেতিক চিহ্ন:** হলুদ রঙের বৃত্তের উপর কালো রঙের তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি **পটভূমি:** হলুদ বর্ডারের উপর সাদা		**পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যের বিন-সাংকেতিক চিহ্ন:** সবুজ রঙের বৃত্তের ভিতরে কালো রঙের তিনটি তীর চিহ্ন **পটভূমি:** সবুজ রঙের বর্ডারের উপর সাদা	

১.১০.৫ চিকিৎসা বর্জ্যের প্যাকেটজাতকরণের সাংকেতিক চিহ্ন

দহনযোগ্য বর্জ্য- **সাংকেতিক চিহ্ন:** বৃত্তের উপর আগুনের শিখা- কালো রঙ **পটভূমি:** হলুদ রঙ		**তেজস্ক্রিয়/ বিকিরণযোগ্য বর্জ্য-** **সাংকেতিক চিহ্ন:** ঘূর্ণায়মান কালো পাখা- কালো রঙ **পটভূমি:** উপরে অর্ধেক হলুদ ও নিচের অর্ধেক সাদা রঙ	
সংক্রামক বর্জ্য **সাংকেতিক চিহ্ন:** দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি- কালো রঙ **পটভূমি:** সাদা রঙ		**ক্ষয়কারক বর্জ্য-** **সাংকেতিক চিহ্ন:** হাত এবং একটি ধাতুর প্রতি আকর্ষিত দুটি পাত্র থেকে উপচিয়ে পড়া কালো রঙ **পটভূমি:** উপরে অর্ধেক সাদা রঙ নিচের অর্ধেক ও নিচের অর্ধেক সাদা বর্ডারে কালো রঙ।	
জীবানুযুক্ত বর্জ্য (Infectious substance) সাংকেতিক চিহ্ন: বৃত্তের উপর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি- কালো রঙ পটভূমি: সাদা রঙ		**অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য** (Other hazardous substance) **সাংকেতিক চিহ্ন:** – উপরের অর্ধেক অংশে সাদা রঙের পটভূমিতে কালো রঙের সাতটি লম্বা দাগ **পটভূমি:** নিচের অর্ধেক কালো বর্ডারে সাদা রঙ।	

জব-১ সঠিকভাবে PPE পরা ও খোলার পদ্ধতি

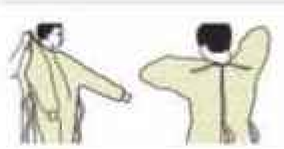
পারদর্শীতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান কর।
- ধাপ অনুসারে একটির পর একটি পিপিই পরিধান কর।
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ কর।
- কাজে সহায়তা করার জন্য একজন সহকর্মী প্রস্তুত রাখুন।
- ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বর্জ্য (বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ) ধারকে ফেলে দিন।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)/প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়্যালস: একটি পিপিই সেটে থাকে-

১. গাউন ২. পলি এপ্রোন ৩. অ্যালকোহল প্যাড ৪. সু-কাভার ৫. গ্লাভস ২ জোড়া ৬. এন-৯৫/ সার্জিক্যাল মাস্ক, ৭. চশমা বা গগলস। ৮. হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ ৯. বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগ ১০। স্যানিক্লথ

কাজের ধারা:

১। প্রথমে হাত ধুয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে। হাতের ওপরে এবং আঙুলের ফাঁকে, আঙুলের পেছনের উঁচু জায়গা এবং বুড়ো আঙুলের পেছনে ভালো করে পরিষ্কার করে হাতের কবজি একইভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর এক জোড়া গ্লাভস পরে নিতে হবে। এসময় খেয়াল রাখতে হবে, গ্লাভস হাতে ফিট করে কিনা। যার হাতে যেটা ফিট করে সেটাই পরা উচিত। এজন্য আগে থেকেই হাতের মাপ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।	   
২। তারপর গাউন পরতে হবে। চেষ্টা করতে হবে গাউন যেন মাটির মধ্যে না লাগে। এজন্য গুটিয়ে গাউন পরতে হবে। গাউনের ক্যাপ আগেই পরা যাবে না।	
৩। এরপর মাস্ক পরে নিতে হবে। মাস্কের বাইরের অংশে হাত লাগিয়ে পরতে হবে। মাস্ক পরার পর নাকের ওপরের সিল করা অংশ হাত দিয়ে চেপে বসাতে হবে, যাতে মাস্ক ভালোভাবে বসে যায়।	
৪। এরপর গগলস পরতে হবে। যারা চশমা পরেন তারা চশমা পরার পর গগলস পরবেন। গগলসের দুইপাশে থাকা ফিতার মতো অংশ ভালোভাবে টেনে নিতে হবে। এতে সেটি ভালোমতো ফিট হয়ে যাবে।	
৫। এরপর গাউনের ক্যাপ দিয়ে মাথা ঢেকে নিতে হবে। গগলসের ওপরে দুটি বাটন আছে। এতে গাউনের ক্যাপ ভালোভাবে বসিয়ে নিতে হবে। অনেকসময় গাউন পরার পর গলার অংশে একটু ফাঁক থাকতে পারে। তখন মাইক্রোপোর দিয়ে জায়গাটি বন্ধ করে দিতে হবে। গাউন পরার পর সু -কাভার পরে নিতে হবে।	
৬। এরপর অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য পলি এপ্রোন গাউনের ওপর পরতে হবে। পলি এপ্রোন পেছনে বেঁধে নিতে হবে।	
৭। এখন আরেকটি গ্লাভস পরতে হবে। অর্থাৎ মোট দুইটি গ্লাভস পরতে হবে। গ্লাভস পরার পর হাতের কবজির অংশ ফাঁকা থাকলে আরেকটি মাইক্রোপোর দিয়ে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে নিতে হবে।	
৮। রোগীর কাছে যাওয়ার আগেই পিপিই খোলার জায়গা বা ডফিং এরিয়া ঠিক করে নিতে হবে। এজন্য বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগ লাগবে। এই ব্যাগটি একটি বিনের ওপর সাজিয়ে নিতে হবে।	

১০৩১

খ। পিপিই খোলার নিয়ম:



১। পিপিই ব্যবহারের পর ডফিং এরিয়াতে এসে স্যানিক্লথ দিয়ে গ্লাভস এবং সু-কাভার প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এবার সু কাভার খুলতে হবে। পেছন দিক থেকে সু কাভার খুলে বিনে ফেলতে হবে।	
২। এরপর পলি এপ্রোন মাথার পেছন থেকে ধরে সামনে এনে খুলে বাইরের দিকটা ভেতরে ঢুকিয়ে ভাঁজ করে বিনে ফেলতে হবে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আবার হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে।	
৩। এবার প্রথম গ্লাভসটি খুলতে হবে। গ্লাভসের বাইরের অংশ যেন ভেতরের দিকে থাকে সেভাবে খুলতে হবে। পিপিই খোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে, শরীরে যেন কোনো স্পর্শ না লাগে।	
৪। প্রথমে গাউন ও হাতের মাইক্রোপোর খুলে বিনে ফেলতে হবে। এরপর গাউনের চেইন খুলে মাথার ক্যাপ খুলতে হবে। গাউনের হাত উল্টে ভেতরের দিকে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, গাউনের বাইরের দিকটি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ও ভেতরের দিকটি পরিষ্কার। গাউন ওপর থেকে এমনভাবে খুলতে হবে যাতে বাইরের অংশটি ভেতরে ঢুকে যায় এবং রোল করে খুলতে হবে যাতে মেঝেতে গাউন স্পর্শ না করে। গাউন বিনে ফেলে দেওয়ার পর অ্যালকোহল প্যাড দিয়ে আবার হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে।	
৫। এরপর গগলস খুলতে হবে। গগলস সামনে একহাত দিয়ে ধরে পেছনে ফিতা খুলে নিতে হবে। এবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আবার হাত পরিষ্কার করে মাস্ক খুলতে হবে। মাস্ক খোলার সময় একহাত দিয়ে মাস্কের বাইরের অংশ চেপে ধরে আরেক হাত দিয়ে একটি একটি করে ফিতা খুলতে হবে। এবার মাস্কও বিনে ফেলে দিতে হবে।	
৬। আবার অ্যালকোহল প্যাড দিয়ে হাত মুছে সবশেষে দ্বিতীয় গ্লাভসটিও খুলে বিনে ফেলে দিতে হবে। যে বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগে এগুলো ফেলা হল সেটি বন্ধ বা সিল করে দিতে হবে। বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগ বন্ধ করার আগে আরেক জোড়া গ্লাভস ও সার্জিক্যাল মাস্ক পরে নিতে হবে।	
৭। এরপর ব্যাগের মধ্যে ১% হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ ফেলে দিয়ে এই ব্যাগ বন্ধ করার সময় মুখ দূরে রাখতে হবে। ব্যাগে ভালো করে প্যাঁচ দিয়ে গিট দিতে হবে। সতর্কতা হিসেবে ব্যাগের বাইরের দিকেও খানিকটা হাইপোক্লোরাইড স্প্রে করে দিতে হবে। এরপর বিনে (বর্জ্য ধারক) রেখে দিতে হবে, যাতে পরবর্তীতে ক্লিনার এসে এটা নিয়ে যেতে পারে।	
৮। সবশেষে যে মাস্ক ও গ্লাভসটি ব্যবহার করা হবে সেগুলো আরেকটি বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগে ফেলতে হবে।	

কাজের সতর্কতা

১. পিপিই কখনোই কর্মস্থলের বাইরে নেয়া যাবে না; ২. পিপিই দিয়ে শরীরের সব অংশ ঢেকে রাখতে হবে; ৩. দুইজন একত্রে পিপিই পরে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একজন অপরজনের উপর নজর রাখা যেতে পারে; ৪. পিপিই খোলার সময় খুব সাবধানে খুলে সেটি ঢাকনা দেওয়া নির্দিষ্ট বিনে রাখতে হবে; ৫. পিপিই খোলার সাথে সাথে গোসল করে নতুন কাপড় পরতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি পিপিই পরা ও খোলার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব-২: অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো

প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়্যালসঃ প্রযোজ্য নহে।

কাজের ধারা:

১। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রটি নির্ধারিত স্থান থেকে ক্যারি হ্যান্ডেল ধরে নামাতে হবে।

২। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রটি নিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে সেফটি লক ও সেফটি পিন টান দিয়ে খুলতে হবে।

৩। বাতাসের অনুকুলে দাড়াতে হবে।

৪। বাম হাত দিয়ে ডিসচার্জ পাইপের নলটি আগুনের উৎসের দিকে টার্গেট করে রাখতে হবে।

৫। ডান হাত দিয়ে ক্যারি হ্যান্ডেল ধরে নলটি আগুনের উৎসের দিকে তাক করে রাখতে হবে।

৬। অপারেটিং লিভার চাপ দিয়ে এভাবে আগুনের উৎস টার্গেট করে পাইপের নলটি সুইপ করিয়ে আগুন নিভাতে হবে।

- **কাজের সতর্কতা**

১। বাতাসের অনুকুলে ব্যবহার করা।

২। যথাসম্ভব আগুনের নিকটবর্তী অবস্থান থেকে ব্যবহার করা।

৩। সরাসরি মানুষের শরীরে ব্যবহার না করা।

৪। ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা যাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

৫। কার্বন ডাই অক্সাইড (CO২) ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহারের সময় সতর্কতার সাথে এর ডিসচার্জ হর্ন ধরা। অসতর্কতার কারণে কুল বার্ণ হতে পারে।

৬। বিভিন্ন ধরনের আগুনের জন্য বিভিন্ন রকমের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রয়েছে। ভুল শ্রেণির অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের ফলে আগুন আরও বাড়তে পারে,তাই সঠিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

৭। এই নীতি মনে রাখতে হবে, বেরিয়ে যান, বাইরে থাকুন, ফায়ার সার্ভিসকে খরব দিন।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝ?
২। ওয়ার্কস্টেশন পরিষ্কার রাখার উপায় লিখ।
৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে কি বুঝায়?
৪। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই-এর সাধারণ প্রকারভেদ লিখ।
৫। পারসনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট বা পি পি ই (PPE) কাকে বলে?
৬। আপদ বা হ্যাজার্ড বলতে কি বুঝ?
৭। নিরাপদ অপারেটিং পদ্ধতি কাকে বলে?
৮। জরুরি বহির্গমন কি?
৯। ট্যাগিং পদ্ধতি কি?
১০। নসোকোমিয়াল ইনফেকশন কি?
১১। সংক্রামক বর্জ্য বিনের সাংকেতিক চিহ্ন ও কালার কোড কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় করণীয় কি?
২। সঠিক দেহ ভঙ্গি (Body Posture) বজায় রাখা বলতে কি বুঝ?
৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বলতে কি বুঝ? এর গুরুত্ব কি?
৪। স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব কি? লিখ।
৫। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নীতিমালাগুলো কি?
৬। অনুজীব ও জীবাণু আপদ কি? আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড কাকে বলে?
৭। কর্মক্ষেত্রে আপদ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রধান উপায় কি?
৮। কয়েকটি অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম এর নাম উল্লেখ কর।
৯। ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার সহজে মনে রাখার উপায় কি?
১০। নোসোকোমিয়াল ইনফেকশনের প্রকারভেদ কি কি?
১১। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া বলতে কি বুঝায়?
১২। বর্জ্যের প্রকারভেদগুলো কি কি? ধারাল বর্জ্যের বিনের সাংকেতিক চিহ্ন, কালার কোড ও পটভূমি কি রকমের?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানসমূহ উল্লেখ কর।
২। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৩। কর্মক্ষেত্রে প্রধান প্রধান আপদ মোকাবেলায় করণীয় উল্লেখ কর।
৪। বহির্গমন পথের বিধিমালাসমূহ বর্ণনা কর।
৫। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
৬। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R সম্পর্কে বুঝিয়ে লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিকের প্রাথমিক ধারণা

Basic concept of patient care technique



কেয়ারগিভিং বা সেবা প্রদান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৈনন্দিন জীবনের আর দশটি স্বাভাবিক কাজের মতই আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে নানারকম কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকি। যেমন, বাবার পরিধেয় কাপড়গুলো পরিষ্কার করে দেওয়া, মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, ওষুধ খাওয়ার সময় পরিবারের অসুস্থ কাউকে পানির গ্লাসটি এগিয়ে দেওয়া, কখনো বাবা-মা কিংবা বয়স্ক দাদা-দাদী, নানা-নানীর সাথে খোশগল্পে মেতে উঠা। এভাবেই নানাবিধ পারিবারিক কাজ আমরা প্রায়শই সম্পাদন করে থাকি; এগুলো কেয়ার গিভিং বা সেবা প্রদানের অত্যন্ত মৌলিক কিছু কার্যাবলি। কেয়ার গিভিং বা সেবা প্রদান কখনো হতে পারে এরকম স্বাভাবিক পারিবারিক কার্যক্রমকে ঘিরে, আবার কখনো কখনো হতে পারে পরিবারের কারো শারীরিক বা মানসিক হালকা থেকে গুরুত্তর কোনো সমস্যাকে ঘিরে। পরিবারের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আমাদের মনোযোগ ও কার্যাবলির মূল লক্ষ্য হয়ে উঠে অসুস্থ প্রিয় মানুষটির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। এভাবেই আমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে কেয়ার গিভিং বা সেবা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ যা পরবর্তিতে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে ক্যারিয়ার গড়তে আমাদেরকে অনেক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক কী তা বলতে পারব।
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিভাষা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারব।
- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ অনুশীলন করতে পারব।
- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক সেক্টরের কর্মপরিধি বর্ণনা করতে পারব।
- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান ও পেশেন্টের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

২.১ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক কি?

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক বলতে সাধারণত কিছু সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের মাধ্যমে একজন ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের তত্ত্বাবধানে থেকে রোগীদের প্রাথমিক যত্ন ও পরিচর্যা প্রদানের কার্যক্রমকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর যিনি এই প্রাথমিক যত্ন প্রদানের কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন তাকে বলা হয় পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান বা কেয়ার গিভার বা সেবা প্রদানকারী। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক বা সেবা প্রদানের এই ধারণাটি আমাদের দেশে তুলনামূলক ভাবে নতুন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে এটি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান যেকোনো বয়সের পেশেন্ট বা রোগী নিয়ে কাজ করে থাকেন। তবে এই সেবা প্রদানের কাজটি অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটু বেশিই প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগ ও ব্যাধি। বিশ্বায়নের এই যুগে ক্রমবর্ধমান এ বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সাধারণ সেবা দেওয়ার মত সময় অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের হাতে থাকে না। এই জন্য অসুস্থ রোগী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক বা কেয়ারগিভিং সেবা একটি অপরিহার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.২ স্বাস্থ্য কী?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা বা ভালো থাকার (ওয়েলবিং) একটি পুর্ণাঙ্গ অবস্থা; কেবলমাত্র রোগ কিংবা দুর্বলতা না থাকাই নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সংজ্ঞানুযায়ী একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের চারটি দিক রয়েছে। যেমন:

১। **শারীরিক:** শরীরের বিভিন্ন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ শারীরিক স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় মানব দেহের গঠন ও কার্যক্রমকে যথাক্রমে এনাটমি ও ফিজিওলজি নামে অবহিত করা হয়। যে ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো আছে তার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়াগুলো ভালোভাবে কাজ করছে বলা যায়। এটি শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতির কারণেই নয়। নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম পুষ্টি এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম সবই শারীরিক সুস্বাস্থ্যের জন্য অবদান রাখে। শারীরিকভাবে সুস্বাস্থের অধিকারী একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ড সাধারণত নিজে নিজেই সম্পাদন করতে পারেন।

২। **মানসিক:** মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজের সক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক চাপের সাথে মোকাবিলা করতে পারে এবং উৎপাদনশীল এবং ফলপ্রসূভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক গোষ্ঠী বা কমিউনিটিতে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৩। **সামাজিক স্বাস্থ্য:** সামাজিক স্বাস্থ্য বলতে সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গঠন ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সংযুক্ত হবার ও অবদান রাখার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সক্ষমতাকে বুঝায়। এটি বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে আমরা কতটা স্বাচ্ছন্দে মানিয়ে নিতে পারি তার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক সম্পর্ক আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৪। **আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য:** আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বলতে একটি অতিমানবীয় শক্তির উপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করে বিভিন্ন কর্মকাড ও আচরণের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক বিষয়কে বুঝানো হয়। আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য মানুষের জীবনের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিকগুলোর মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে।

২০২৪

২.৩ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিভাষা

স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করতে গেলে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংক্ষেপিত রূপ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শব্দসমূহ সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। কোনো শব্দ যদি ভুলভাবে ব্যবহার কিংবা ব্যাখ্যা করা হয়, এর পরিণতি ভুল বোঝাবুঝি থেকে শুরু করে রোগীর মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এইজন্য এই সকল শব্দ ও পরিভাষা খুবই সতর্কতার সাথে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার পূর্বশর্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেকোনো শব্দ মূলত দুই, তিন বা তার বেশি অংশে গঠিত। যেমন:

প্রিফিক্স	রুট	সাফিক্স
একটি শব্দাংশ যেটি শব্দমূলের পুর্বে বসে তার অর্থ পরিবর্তন করে থাকে।	রুট হলো একটি শব্দাংশ যেটি শব্দটির মুল অর্থ ধারন করে থাকে। প্রিফিক্স ও সাফিক্সের মাঝের অংশটুকুই হলো মূলত রুট বা শব্দমূল।	সাফিক্স শব্দমূলের পরে বসে এর অর্থ পরিবর্তন করে থাকে। সাফিক্স ও প্রিফিক্স সাধারণত একাকী ব্যবহৃত হয়না।

যেমন: প্রিফিক্স Dys (Difficult) এবং শব্দমূল pnea (breathing) এর সমন্বয়ে আমরা পাই Dyspnea (ডিসনিয়া) যার অর্থ difficulty breathing বা শ্বাসপ্রশ্বাসে জটিলতা। আবার, মাস্ট বা mast (স্তন) শব্দমূল সাফিক্স ectomy (কেটে) এর সাথে সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় mastectomy, যার অর্থ হলো স্তন অপসারণ করা। এভাবে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এরকম কিছু স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু পরভাষার অর্থ বুঝা ও প্রয়োগ করা একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য অপরিহার্য।

মেডিকেল এরিয়া	শব্দমূল উদাহরণ
Agents of Infection- Fungi	'myc' meaning 'fungus' as in 'mycosis'
Body Fluids- Saliva	'sial' meaning 'saliva' as in 'sialogram'
Body structure or anatomy- regions of the body	'pneumon' meaning 'lung' as in 'pneumonia'
Chemical compounds- sugar	'gluc' meaning 'sugar' as in 'glucose'
Colours	'leuk' meaning 'white' as in 'leukomia'
Physical factors- temperature	'therm' meaning 'heat' as in 'thermometer'

Prefix	Meaning	Prefix	Meaning	Suffix	Meaning
a- or –an	without	hypo-	deficiency	algia	Pain
ab-	away from	inter-	between	cele	Swelling
ad-	towards	intra	inside	dema	Swelling
anti	against	pan-	all	Ectomy	Surgical removal
asthen	weakness or lack	poly	Many	ism	Condition
bi	two	post	After or behind	itis	Inflammation
endo	within	pre	before	osis	Disease or condition
edem-	Swelling	sub	Below	pathy	Disease
epi	upper	Super/supra	Above	Sclerosis	Hardening
hyper	Excessive	trans	Across		

২০২৪

এ সংশ্লিষ্ট কিছু উদাহরণ নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

মূল শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	প্রায়োগিক অর্থ
Tachycardia	ট্যাকিকার্ডিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হৃদস্পন্দন
Bradycardia	ব্র্যাডিকার্ডিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে কম হৃদস্পন্দন
Hypertension	হাইপারটেনশন	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপ
Hypotension	হাইপোটেনশন	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপ
Polyuria	পলিইউরিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে প্রশাবের পরিমাণ বেশি হওয়া
Oliguria	অলিগুরিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে প্রশাবের পরিমাণ কম হওয়া
Hyperthermia	হাইপারথার্মিয়া	শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়া
Hypothermia	হাইপোথার্মিয়া	শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া
Asthma	এজমা	হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট
Acute	একিউট	রোগের তাৎক্ষণিক তীব্র অবস্থা
Chronic	ক্রনিক	রোগের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা
Lungs	লাংগ্‌স	ফুসফুস
Heart	হার্ট	হৃৎপিণ্ড
Kidney	কিডনি	বৃক্ক
Brain	ব্রেইন	মস্তিষ্ক
Liver	লিভার	যকৃত
Stomach	স্টোমাক	পাকস্থলি

শরীরের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য বিশেষ কতগুলো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন:

- External- বহিঃস্থ, বর্হিভাগ, বাহির
- Internal- অন্তঃস্থ, অভ্যন্তর, ভিতর
- Anterior- সম্মুখাংশ, সম্মুখ, সামনে
- Posterior- পশ্চাদাংশ, পশ্চাৎ, পেছনে
- Lateral- পার্শ্ব, পার্শ্বদিকে
- Distal- দূরবর্তী অংশ, কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে
- Medial- মধ্যবর্তী অংশ, মধ্যরেখার কাছাকাছি
- Proximal- নিকটবর্তী অংশ, কেন্দ্রস্থল অভিমুখে
- Superficial- উপরে বা উপরিভাগে, ভাসমান অংশ
- Deep- ভিতরে বা গভীরে
- Peripheral- প্রান্তীয়, দূরবর্তী

Abbreviation বা সংক্ষেপিত শব্দ:

Abbreviation বা সংক্ষেপিত শব্দ হলো চিকিৎসা সম্পর্কিত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সময় ও স্থান কমিয়ে আনে। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শব্দ সংক্ষেপ ব্যবহার করতে হয়। সঠিক শব্দ জানা না থাকলে অনুমানের উপর ভর করে না লিখে তার পূর্ণ রূপ লিখতে হয় যাতে করে সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে ওষধ খাওয়াতে গেলে প্রেসক্রিপশনে থাকা নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য শব্দ-সংক্ষেপ জানা অতীব জরুরি। বহুল ব্যবহৃত কিছু সংক্ষেপিত শব্দ হলো:

২০২৪

সংক্ষেপিত রূপ	পূর্ণ রূপ	সংক্ষেপিত রূপ	পূর্ণ রূপ
BID	Twice a day	NaCl	Sodium Chloride
TDS	three times a day	DM	Diabetes Mellitus
Ac	before meals	DOB	Date of Birth
Amp	Ampule	ENT	Ear, Nose, Throat
Ant.	Anterior	HTN	hypertension
BMI	Body Mass Index	Hx	history
BP	Blood Pressure	Inj.	Injection
RBS	Random Blood Sugar	IM	Intramascular
FBS	Fasting Blood Sugar	IV	Intravenous
C.C.	Chief Complaint	SC	Sub cutenous
C/O	Complaints of	Mm of Hg	Milimeters of Mercury
C&S	Culture and Sensitivity	mMol	Mili mole
CBC	Complete Blood Count	Rx	Prescription
Cap.	Capsule	Syr	Syrup
Tab.	Tablet	Tsp	Teaspoon
cc	Cubic Centimeter	RBC	Red Blood Cell
Cm	Centimeter	WBC	White Blood Cell
CNS	Central Nervous System	Mcg	microgram
XR	x-ray	NS	Normal Saline
CXR	chest x-ray	ICU	Intensive Care Unit

২.৪. স্বাস্থ্য সেবা দানকারী দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে কাজ করতে হয় একটি হেল্‌থ কেয়ার টীম বা স্বাস্থ্য সেবা দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে। এই দলটি গঠিত হয় ক্লায়েন্ট বা সেবা গ্রহীতা ব্যক্তি, তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং স্বাস্থ্য সেবা দানকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা পেশাজীবীর সমন্বয়ে।



চিত্র ২.১: স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দল

স্বাস্থ্যসেবা দানকারী দলের প্রত্যেকেরই আছে সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের দলীয় উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের জন্য অবদান রেখে থাকেন, যা হলো একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রোগীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা প্রদান করা। স্বাস্থ্য সেবা দলের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে 'পেশেন্ট বা রোগী বা ক্লায়েন্ট' এবং বাকি সদস্যরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে থাকে। একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য স্বাস্থ্য সেবা দলের বিভিন্ন সদস্যদের সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচের ছকে এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দলের সদস্য	প্রধান কর্তব্যসমূহ
ডাক্তার	রোগীর রোগ নির্নয়ের কাজটি করে থাকেন, চিকিৎসা ও ঔষধের নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন, চিকিৎসা ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন এবং মেডিক্যাল কেয়ারের সামগ্রিক কাজটি তদারকি করে থাকেন। একজন ডাক্তারের বিশেষায়িত প্র্যাকটিসের ধরন বহুবিধ হতে পারে যেমন: কার্ডিওলোজিষ্ট, নিউরোলোজিষ্ট, বা ইউরোলোজিষ্ট, সার্জন, সাইকিয়াট্রিষ্ট বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি।
রেজিস্টার্ড নার্স	রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় হেল্থ এসেসমেন্টের কাজ করা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কেয়ার প্ল্যান প্রস্তুত করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নার্সিং সেবা প্রদান করা, নার্সিং ও অন্যান্য অধীনস্ত স্বাস্থ্য সেবা সদস্যদের কাজের তদারকি করা। ডাক্তারের ন্যায় একজন নার্সেরও বিশেষায়িত সেবার বিভিন্ন ধরন হতে পারে; যেমন আইসিইউ নার্স, মেনটাল হেল্থ এন্ড সাইকিয়াট্রিক নার্স, পেডিয়াট্রিক নার্স প্রভৃতি।
ফিজিওথেরাপিষ্ট	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রিত নড়চড়া বা ব্যায়ামের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
স্পীচ থেরাপিষ্ট	রোগীর কথা বলা, চাবানো বা গলধকরণের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
অকুপেশনাল থেরাপিষ্ট	রোগীর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকান্ড নিজে নিজের সম্পাদন করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট থেরাপি বা কর্মসূচি প্রদান করা।
ডায়েটিশিয়ান	রোগীর চাহিদা ও খাদ্য-পুষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী ডায়েট প্ল্যান করে থাকেন যেটা রোগীকে সেরে উঠতে বা সুস্থ থাকতে সহায়তা করে।
সোশ্যাল ওয়ার্কার	একজন পেশাজীবী যিনি রোগীর প্রাত্যহিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে রোগীকে সামাজিক ও মানসিকভাবে কর্মক্ষম রাখতে ভূমিকা রাখান।
সাইকোলোজিষ্ট	মানসিক রোগ নির্নয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের কাজটি করে থাকেন।
ফার্মাসিষ্ট	ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীকে ঔষধ প্রদানের কাজটি করে থাকেন এবং রোগীকে ওষধ সেবনের পদ্ধতি,এর কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হেল্থ এডুকেশন দিয়ে থাকেন।
প্যাথোলোজিষ্ট	ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীর রোগ নির্নয়ের জন্য বিভিন্ন ল্যাব পরীক্ষা কাজটি করে থাকেন এবং রোগ নির্ণয়ে ডাক্তারকে সহযোগীতা করে থাকেন।

২.৫ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কর্মক্ষেত্র

একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান স্বাস্থ্য সেবার অনেক জায়গায় কাজ করতে পারেন। সেবার ধরন অনুযায়ী এগুলো অনেক রকমের হতে পারে। সকল সেটিংসেই পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কাজের ধরন মোটামুটি একই রকম। যেমন:

হাসপাতাল বা ক্লিনিক: হাসপাতাল বা ক্লিনিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিছু কিছু হাসপাতাল হচ্ছে জেনারেল, যেখানে সবধরনের রোগীকে সেবা দেওয়া হয়। আবার বিশেষায়িত হাসপাতালে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সেবা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ; মেডিসিন, সার্জারি বা অপারেশন সংক্রান্ত, কার্ডিওলোজি বা হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত, ইমারজেন্সি বা জরুরি সেবা, ইনটেনসিভ কেয়ার বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র, সাইকিয়াট্রিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, মেটার্নাল ও চাইল্ড হেল্থ বা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রভৃতি।	
ডাক্তারের চেম্বার: ডাক্তারগণ সাধারণত তাদের বিশেষায়িত দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকের পাশাপাশি ব্যক্তিগত চেম্বারেও রোগী দেখে থাকেন। এসকল ক্ষেত্রে রোগীর বিভিন্ন শারীরিক ভাইটাল সাইন্স বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণসমূহ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।	
নার্সিং হোম: নার্সিং হোম হল বয়স্ক বা কোনো শারীরিক বা মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের আবাসিক যত্ন প্রদানের একটি সুবিধাস্থল। নার্সিং হোমগুলোকে দক্ষ নার্সিং সেবা কেন্দ্র, দীর্ঘমেয়াদী যত্ন প্রদান কেন্দ্র, ওল্ড হোম, বিশ্রামের ঘর, নিরাময় হোম হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। নার্সিং হোমের ধারণাটি আমাদের দেশে এখনো প্রচলিত নয়, তবে উন্নত বিশ্বে এটি বহুল পরিচিত।	
বৃদ্ধাশ্রম বা ওল্ড হোম: ওল্ড হোম হল এমন একটি জায়গা যেখানে বয়োঃবৃদ্ধগণের যত্ন করা হয়, যারা সাধারণত নিজেদের স্বাভাবিক কার্যাবলি শারীরিক রুগ্নতার কারণে আগের মত নিতে পারেন না তাদের পরিচর্যা করা হয়। এ ধরনের সেবাকেন্দ্র আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।	
হোম কেয়ার সেটিংস: বর্তমানে অনেক ব্যক্তিই নিজের বাড়িতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন। হোমকেয়ার এজেন্সিগুলো গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের বয়সের মানুষের জন্যই বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে মূলত সার্বক্ষণিকভাবে একজন কেয়ারগিভারের মাধ্যমে রোগী বা গ্রাহককে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি ডাক্তার বা নার্সের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই ধারণাটি খুবই সাম্প্রতিক হলেও অল্প কদিনেই এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়কাল থেকে বহু হোম কেয়ার এজেন্সি এ ধরনের সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছে, যেখানে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করার জন্য ব্যাপক সংখ্যক কেয়ারগিভারের চাহিদা রয়েছে।	

ডে-কেয়ার সেন্টার: ডে কেয়ার সেন্টার হলো সাধারণত এমন একটি সেবা প্রদান কেন্দ্র যেখানে কর্মজীবি বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাকে রেখে চাকুরী বা অন্যান্য কাজ করে থাকে। এ ধরনের সেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদেরকে গোসল করানো, খাবার খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো এরকম নানারকম কাজ সম্পাদন করতে হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে বাচ্চাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি বাচ্চাদের সার্বিক যত্নে কেয়ারগিভার গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখতে পারে।	
হস্পাইস কেয়ার সেন্টার: হস্পাইস (বা হস্পিস) কেয়ার সেন্টারে অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন, স্বাচ্ছন্দ ও জীবন মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সেবা প্রদান করা হয় । এরূপ কোনো কোনো সময় কোনো গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওষুধ বা অন্য কোনো উপায়ে রোগ নিরাময় সম্ভব না হলে তার মৃত্যু প্রক্রিয়াটিকে সহজ ও সহনশীল করার জন্য এ ধরনের সেবা প্রদানের পদ্ধতি উন্নত বিশ্বে চালু আছে। আমাদের দেশেও এটির প্রচলন আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে যেখানে প্রচুর সংখ্যক কেয়ারগিভারের প্রয়োজন রয়েছে।	

২.৬ গৃহে রোগীর পরিচর্যা

হোম কেয়ার সেটিংসে অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা দেওয়ার জন্য কেয়ারগিভারকে বিশেষ কিছু বিষয়ে নজর দিতে হয়। বাড়িতে রোগীকে আরাম ও বিশ্রাম দেওয়ার জন্য কোলাহলমুক্ত, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা দরকার। আর সে কারণেই রোগীর জন্য আলো বাতাস পূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্মত একটি পৃথক কক্ষের প্রয়োজন হয়। রোগীকে নির্দিষ্ট কক্ষে রেখে তার উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করতে পারলে রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি, রোগমুক্তি আরোগ্য, আরাম অথবা উপশম করা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

রোগীর কক্ষের সাজসরঞ্জাম: রোগীর কক্ষটি খোলামেলা ও ছিমছাম হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম রোগীর কক্ষে রাখা উচিৎ নয়। শুধুমাত্র রোগীর উপযুক্ত পরিচর্যা ও প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হয়, যাতে সহজেই তা হাতের কাছে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

- থার্মোমিটার, স্ফিগমোমেনোমিটার, স্টেথোস্কোপ; চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র ও ফাইল
- ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র
- ঔষধ মাপার কাপ (মেজারিং কাপ) ও চামচ; ফিডিং কাপ, গ্লাস, প্লেট ও পানির জগ
- বেডপ্যান, ইউরিনাল, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যাগ
- ঘড়ি, কলিং বেল, টর্চ লাইট; সহায়ক লাঠি, ক্রাচ কিংবা হুইলচেয়ার;(প্রয়োজন হলে)
- রুম হিটার ও ওয়াটার হিটার, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বা ফার্স্ট এইড বাক্স
- বালতি, মগ, সাবান, শ্যাম্পু, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

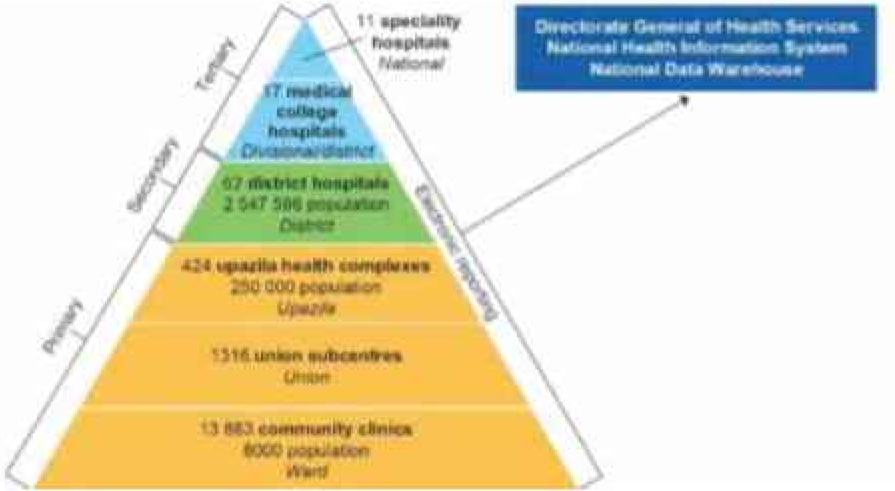
২০২৪

২.৭ রোগীর কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রোগীর কক্ষের ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথমে কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। কক্ষের আসবাবপত্র, রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, বালিশ, চাদর সবকিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখা দরকার। পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে সহজে রোগ নিরাময় বা আরামদায়ক অবস্থা নিশ্চিত হয়। অপরদিকে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ রোগীর জন্য মোটেও নিরাপদ নয়; এটি রোগীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। রোগীর ঘর প্রতিদিন ফিনাইল বা ডেটল পানি দিয়ে ভালো করে মুছতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত প্লেট, গ্লাস, বেডপ্যান ইত্যাদি সরঞ্জাম প্রতিদিন ডিশ পাউডার ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে শুকনো করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। কক্ষের দরজা ও জানালায় সাদা ও হালকা রঙের পর্দা ব্যবহার করলে ভালো হয়। পর্দা ব্যবহার করলে বাইরের ধুলাবালি ও কড়া রোদ কক্ষে প্রবেশ করতে পারেনা। রোগীর ব্যবহৃত প্রতিদিনের ময়লা কাপড়গুলো প্রতিদিন ভালোভাবে ধুয়ে শুকাতে হবে। এছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, মশারি, তোয়ালে বা গামছা, রুমাল ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। দরজা ও জানালার গ্রিল ডেটল পানি দিয়ে মুছতে হবে। রোগীর ব্যবহারের লেপ, তোষক, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে। রোগির মলমূত্রাদি যথাসম্ভব দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। রোগীর কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম, টয়লেট প্রতিদিন ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। মেঝে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। রোগীর কক্ষে যেন মশা-মাছির উপদ্রব না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর কক্ষ ও বসবাসের পরিবেশ ভালো হলে তা রোগীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠার জন্য সহায়ক হয়।

২.৮ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য খাত একটি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বলা হয়ে থাকে, যে দেশের জনগণ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এগিয়ে, সে দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে গতিশীল। হেল্‌থ কেয়ার সিস্টেম বলতে স্বাস্থ্য চাহিদা মেটাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদের একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাকে বুঝানো হয়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সরকারি খাতে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এটি বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সামগ্রিক কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। এর অধীনস্ত কয়েকটি অধিদপ্তরের নাম হলো: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মেডিকেল শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর প্রভৃতি। সরকারি খাতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা: প্রাইমারি বা প্রাথমিক, সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি বা প্রান্তিক। এই তিনটি পর্যায়ে আছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে। অনেক সময় স্বাস্থ্য সমস্যার জটিলতার কারণে একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পর্যায়ের সেবাও গ্রহণ করতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে তিন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। যথা: গ্রাম্য পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে আছে ইউনিয়ন সাব-সেন্টার এবং উপজেলা বা থানা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা হেল্‌থ বা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এরপর জেলা পর্যায়ে আছে জেলা সদর হাসপাতাল যেগুলোকে বলা হয় মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। জেলা হাসপাতালসমূহের সেবা দানের পরিধি ও ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে একটু বিস্তৃত। আবার টারশিয়ারি বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে চিত্রের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়:



চিত্র ২.২: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পিরামিড

২.৯ হাসপাতালে প্রদত্ত সেবাসমূহ

একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিক রোগীর প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে সাধারণত সব ধরনের রোগিকেই চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। একইভাবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গুলোতেও সব ধরনের রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে বিভাগীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত বা স্পেশালাইজ্‌ড হাসপাতালসমূহে নির্দিষ্ট ধরনের রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয় যেমন: জাতীয় মানসিক হাসপাতালে শুধু মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আবার একইভাবে, জাতীয় কিডনি হাসপাতালে শুধুমাত্র কিডনী রোগী, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে শুধুমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে সেবা দেওয়া হয়। একইভাবে নাক-কান-গলা, ফুসফুস ও শ্বষণযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি নির্দিষ্ট অরগান বা অঙ্গ সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে। আবার মেডিকেল কলেজ বা জেনারেল হাসপাতালসমূহে বিশেষায়িত রোগীর পাশাপাশি সাধারণ সকল ধরনের রোগীর জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রভৃতি। নিম্নে একটি বৃহৎ হাসপাতালে যে ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

- **ইমার্জেন্সি বা জরুরি বিভাগ**

  যেকোনো সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি পর্যায়ের হাসপাতালেই জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যায় আগত রোগীদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা ইমার্জেন্সি বা জরুরি বিভাগ চালু থাকে। এখানে সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স, আয়া, ওয়ার্ডবয় ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী সবসময়ই থাকতে হয়। যেকোনো হাসপাতালের সবচে ব্যস্ততম বিভাগ হলো এই জরুরি বিভাগ। এখানে বিভিন্ন জরুরি সমস্যা নিয়ে রোগী আসলেও সড়ক বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরাই বেশি আসেন। এছাড়াও হার্ট এটাক, ব্রেইন স্ট্রোক এধরনের রোগীও এসে থাকেন।

- **বহির্বিভাগ**

  বহির্বিভাগ সেবা একটি হাসপাতালের নিয়মিত সেবাদান পদ্ধতি। এখানে রোগীরা তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমস্যা নিয়ে এসে টিকেট কাটার পর নির্দিষ্ট ডাক্তারের সাথে কথা বলার জন্য লাইনে অপেক্ষা করে।

সাধারণত যে সকল সমস্যা আপাতত তেমন ইমার্জেন্সি নয়, সেগুলোই বহির্বিভাগে দেখানোর উপযোগী। বহির্বিভাগে রোগীর জন্য কোনো শয্যা বা রাত্রিযাপনের ব্যবস্থার প্রয়োজন পরেনা। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী যদি কোনো রোগীর ভর্তির প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে অন্তঃবিভাগ বা ইনডোর সেবার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয়; কিংবা কিছু নির্দেশনা গ্রহণ করে রোগী বাসায় চলে যায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর আবার ফলো আপ ভিজিটে আসেন।

- **আন্তঃবিভাগ বা ইনডোর**

  হাসপাতা আন্তঃবিভাগ: ভর্তিকৃত রোগীকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এখানে। রোগীর সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ইনডোর বা অন্তঃবিভাগ রয়েছে। যেমন:
  - মেডিসিন বিভাগ- যেখানে শুধু ঔষধ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা পাবে এরকম রোগীকে ভর্তি রাখা হয়।
  - সার্জারি ইউনিটে অপারেশনের রোগীদেরকে রাখা হয়।
  - শিশু বিভাগে অসুস্থ শিশুদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।
  - গাইনি ওয়ার্ডে প্রসুতি এবং গাইনি সমস্যা নিয়ে আসা মায়েদের রাখা হয়।


চিত্র ২.৩: ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে এম্বুলেন্স থেকে রোগী নামানো হচ্ছে


চিত্র ২.৪: একটি বহির্বিভাগ টিকেট কাউন্টার।


চিত্র ২.৫: টারশিয়ারি লেভেল হাসপাতালের মেডিসিন অন্তঃবিভাগ

- **প্যালিয়েটিভ কেয়ার:** এখানে গুরুতর অসুস্থ রোগী, যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত গুরুতর অসুস্থ, এরকম ব্যক্তিকে রেখে উপশমকারী সেবা বা প্যালিয়েটিভ কেয়ার দেওয়া হয়।
- **অপারেশন থিয়েটার:** ছোট বড় বিভিন্ন স্পেশালিটির অপারেশনের সুবিধাগুলো বড় বড় হাসপাতালে থাকে। বিশেষজ্ঞ সার্জনের নেতৃত্বে তার দল এই কাজগুলো করে থাকে।

এছাড়াও থাকে প্যাথলজি বিভাগ যেখানে রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন নমুনা পাঠানো হয়। ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট থাকে যেখানে রোগীদের জন্য ওষুধ-পত্র পাওয়া যায়। রোগীদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার জন্য থাকে ফুড এন্ড ডায়েট ডিপার্টমেন্ট। বড় বড় সরকারি হাসপাতালগুলোতে অসহায় ও দুঃস্থ রোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য থাকে সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যেগুলো সাধারণত বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত।

২.১০ হাসপাতালে রোগীকে সেবাদান

যেকোনো হাসপাতালেই রোগীকে সেবাদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি আছে যেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে যেকোনো ব্যক্তি বা রোগী বাংলাদেশের যেকোনো হাসপাতালে সেবা নেয়ার অধিকার রাখে। কোনো রোগী হাসপাতালে আসলে আনুসঙ্গিক কাজ-কর্ম সারার পর ডাক্তার যখন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখনি মূলত চিকিৎসা সম্পর্কিত মূল কাজটি আরম্ভ হয়। চিকিৎসক প্রথমেই রোগীর সমস্যা শোনেন, কিছু প্রশ্ন ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা করেন এবং একটা সাময়িক বা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস করে থাকেন। এর উপর ভিত্তি করে ডাক্তার প্রয়োজনভেদে বিভিন্ন উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পরিপূর্ণভাবে রোগ নির্ণয়ের পরই ডাক্তার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকেন যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারিত হয়।

রোগীর ইতিহাস গ্রহণ, রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা

একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কর্মস্থলে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের অন্যান্য উপাদান সমূহের পাশাপাশি রোগীর নিরাময়মূলক সেবাসমূহ প্রদান করে থাকেন। তিনি কর্মস্থল-এ অবস্থান করে সাধারণ রোগসমূহ নির্ণয় ও ইহার ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনে রেফার করতে সক্ষম হবেন। সেবা গ্রহীতার অসুবিধা সমূহের জন্য প্রথমে তাকে রোগ নির্ণয় করতে হয়। এ জন্য রোগীর পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে করা হলে রোগ নির্ণয় করা সহজতর হবে। এখানে পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হল:

১. রোগীর ইতিহাস গ্রহণ

২. রোগীর শারীরিক পরীক্ষা

(ক) রোগীর সাধারণ পরীক্ষা ও

(খ) রোগীর সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা

৩. ল্যাবরেটরি পরীক্ষা: যখনই রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন তখন সেবা প্রদানকারী রোগের ব্যবস্থাপনা দিবেন। ব্যবস্থাপনা দিতে সমর্থ না হলে তিনি উপযুক্ত কোনো হাসপাতাল/ ক্লিনিক বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং পরবর্তীতে রোগীর চিকিৎসার জন্য ফলোআপ করতে হবে।

রোগীর সীমিত নিরাময়মূলক সেবা প্রদান পদ্ধতি

১) রোগীর ইতিহাস গ্রহণ: হাসপাতালে প্রথম যখন একজন রোগী আসেন তখন চিকিৎসক প্রথমেই রোগীর পূর্ণ ইতিহাস নেন। তার অসুখটি কীভাবে হলো, কখন থেকে হলো, কতদিন ধরে আছে- সম্পূর্ণ ইতিহাসটি তার কাছ থেকে নেওয়া হয়। এগুলোকে বলা হয় রোগীর চীফ কমপ্লেইন বা মূল সমস্যা গুলো নেওয়ার পর পারিবারিক ইতিহাস নেওয়া হয়। জানা হয়, তার পরিবারে এ সমস্ত রোগ আছে কি না। এরপর তার অতীত ইতিহাস নেওয়া হয়। এই রোগটি তার আগে কখনো ছিল কি না, সেটি জানা হয়। তার মেডিক্যাল, সার্জিকেল দুটো ইতিহাসই নেওয়া হয়। নারী হলে তার নারী স্বাস্থ্যের ইতিহাসটিও নেওয়া হয়। তার পেশাগত ইতিহাসও নেওয়া হয়। সে ধূমপান করে কি না, মদ্যপান করে কি না, সেগুলোও জানা হয়; অথবা মাদকাসক্ত কি না সেগুলোও জানা হয়। এগুলো নেওয়ার পর জিজ্ঞেস করা হয়, আরো কোনো অসুবিধা আছে কি না।

- **বর্তমান প্রধান অসুবিধাসমূহ**: কি কি অসুবিধা; কতদিন যাবৎ অসুবিধা; অসুবিধা সমূহের ইতিহাস যেমন- অসুবিধার ধরন, কিসে অসুবিধা বাড়ে বা কিসে কমে।
- বিস্তারিত ইতিহাস; অতীত ইতিহাস; পারিবারিক ইতিহাস (পরিবারের অন্যান্যদের এই অসুবিধা আছে কি না); ব্যক্তিগত ইতিহাস (ধুমপান, তামাক, পান, জর্দা বা অন্যান্য; পেশাগত ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাস (পানির উৎস, দৈনন্দিন খাবার দাবার ইত্যাদি);

২) শারীরিক পরীক্ষা: এরপরের পর্যায় হলো রিভিউ অব সিস্টেম। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা দেখা হয়। যদি রোগী কাঁশি নিয়ে আসে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয় অ্যাজমা, ব্রংকাইটিস বা অ্যালার্জি ছিল কি না। রিভিউ অব সিস্টেমের (পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ) ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে যাওয়া হয়। শুরু হয় চোখ দিয়ে। তার চোখে কোনা অসুবিধা আছে কি না: দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার সমস্যা আছে কি না। তার মাথাব্যথা রয়েছে কি না। তার প্রতিটি সিস্টেম (পদ্ধতি) অনুযায়ী অবস্থা জিজ্ঞেস করা হয়।

- **দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ**: রক্ত স্বল্পতা পরীক্ষা অথবা জন্ডিস, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়, ইডিমা পরীক্ষা, ওজন মাপ (শিশুদের ও গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে), সায়ানোসিস, স্ফীত লসিকা গ্রন্থি পরীক্ষা।

রোগীর সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা: রোগীর প্রধান অসুবিধা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরীক্ষাসমূহ।

উদাহরণ-১: পেটে ব্যথার ক্ষেত্রে - পেট পরীক্ষা করতে হবে; পেটের কোথায় ব্যথা- নাভীর চারদিকে কিংবা তলপেটে; পেট ফুলে আছে কি না, টেন্ডার কিনা ইত্যাদি।

উদাহরণ-২: শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে - বুক পরীক্ষা (ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড) করতে হবে।

উদাহরণ-৩: কোনো ক্ষত থাকলে (ক্ষতের পরীক্ষা করা, ক্ষত হতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না, ক্ষত পরিষ্কার আছে কি না, ক্ষতে কোনো ইনফেকেশন সংক্রমণ চিহ্ন আছে কি না, ক্ষতে কোনো বাহ্যিক বস্তু বা Foreign Body আছে কিনা)।

ব্যবস্থাপনা: ব্যবস্থাপনার ৪টি পর্যায়, যথা:

১। সাধারণ ব্যবস্থাপনা:যেমন- রোগীর বিশ্রাম ও রোগের কারণ অনুযায়ী খাদ্য নির্ণয়

২। লক্ষণ ও উপসর্গের ব্যবস্থাপনা: যেমন- ব্যথার জন্য ব্যথানাশক বড়ি

৩। নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা- রোগের কারণ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসা প্রদান; যেমন- কৃমিনাশক বড়ি।

৪। জটিলতার ব্যবস্থাপনা; যেমন- কৃমির জন্য যদি ইন্টেসটিনাল অবস্ট্রাকশন বা অন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে উন্নতর চিকিৎসা প্রদান।

চিকিৎসকগণ এভাবে রোগের ইতিহাস গ্রহণ করার মাধ্যমে উপসর্গসমূহ এবং পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ বিশ্লেষণ পূর্বক সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসা বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান দিয়ে থাকেন। এই সামগ্রিক কাজটি এক জনের নেতৃত্বে হলেও কাজটি কখনোই একা করা সম্ভব হয়না। নার্স, প্যাথোলোজিষ্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সবাই মিলে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম হিসেবে এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হয়। ডাক্তার, নার্সসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পেশাজীবিদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে এবং নিজেদের কার্যপরিধিতে উল্লেখিত সেবাসমূহ রোগীদেরকে সুচারুরূপে প্রদান করার মাধ্যমে কেয়ারগিভার এই স্বাস্থ্যসেবা দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

২.১১ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান সাধারণত একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার বা নার্স বা অন্যান্য পেশাদার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে একজন অসুস্থ, আহত বা অক্ষম (ডিসেবল্ড) ব্যক্তিকে প্রাথমিক ও মৌলিক সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার একটি বড় অংশ হচ্ছে অসুস্থ, আহত বা অক্ষম ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান করা যেমন; খাওয়ানো, গোসল করানো, জামা-কাপড় পরিধান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সহায়তা প্রদান করা, টয়লেট ব্যবহার ও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে সহায়তা প্রদান করা প্রভৃতি। এছাড়াও, চিকিৎসকের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী বেসিক হেল্থ স্ক্রিনিং (Health Screening) যেমন; ভাইটাল সাইন, শরীরের উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতি পরিমাপ করা ও তত্ত্বাবধায়কের নিকট রিপোর্ট করা। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী দল বা হেল্থ কেয়ার টিমের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রোগীর ভর্তি ও ছাড়পত্র পূরণ, রোগী স্থানান্তর ও একটি নিরাপদ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশয়ানের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। হোম বেস্ড কেয়ারের ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করতে হয় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। যেহেতু একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে সাধারণত একজন রোগীর সাথে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হয়, তাই রোগীর কোনো বিশেষ পরিবর্তন, অসুবিধা বা অন্যান্য বিষয় প্রথম নজরে আসতে পারে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানেরই। যেমন, রোগীর ঘুমের সমস্যা, ক্ষুদামন্দা হওয়া কিংবা পরের দিনের বিশেষ কোনো কাজ যেমন, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, কিংবা রোগ নির্নয়ের স্যাম্পল বা নমুনা দেওয়ার জন্য প্যাথলজিতে যাওয়া প্রভৃতি। উক্ত কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করার মাধ্যমে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান একজন রোগীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ প্রকাশ পায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হলো, যদিও কাজের ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে এতে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে।

২.১২ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধি

সেবাগ্রহীতার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান অনেক বিস্তৃত কাজ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে রোগীর বসবাসের পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, চিকিৎসা সেবায় সহায়তা করা, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা, রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা ও ডাক্তারকে জানানো এবং সার্বক্ষণিক সাহচার্য প্রদান করা প্রভৃতি।

- রোগীর কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা; রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ পরিমাপ করা; সঠিকভাবে রোগীর রেকর্ড বজায় রাখা; চিকিৎসা পরিচালনার সাথে জড়িত স্বাস্থ্যসেবা দলকে সহায়তা প্রদান করা; রোগ নির্নয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা। যেমন: ইউরিন বা প্রশ্রাব, স্টুল বা পায়খানা, স্পুটাম বা থুথু প্রভৃতি।
- প্রাথমিক নার্সিং কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা। যেমন: ওষুধ খাওয়ানো, রক্তের শর্করা পরিমাপ করা, ইনসুলিন প্রদান করা; রোগীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন নিবন্ধিত নার্স বা চিকিৎসককে রিপোর্ট করা; মানসিক সহায়তা প্রদান এবং রোগীদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য গ্রহণ, সাজসজ্জা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সহায়তা করা; রোগীর স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত দলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখা।
- প্রয়োজনীয় যত্নের বিষয়ে রোগী ও তার স্বজনদেরকে তথ্য প্রদান করা।

শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সেবা প্রদানের এই কাজগুলো একটু ভিন্নতরও হতে পারে। যেমন:

- একেবারে শয্যাশায়ী রোগীর ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা পর পর তার অবস্থার পরিবর্তন বা পজিশনিং করানো।
- বিছানা থেকে হুইলচেয়ার কিংবা হুইলচেয়ার থেকে বিছানায় রোগী স্থানান্তর করা।
- প্রশ্রাব-পায়খানা (টয়লেটিং) ও গোসলে সহায়তা করা। ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীর শারীরিক নড়া-চড়া/ব্যায়াম নিশ্চিত করা।
- রোগীকে সাহচর্য দেয়া এবং তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা।

এ সমস্ত কাজ সাধারণত পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান একটি সুনির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী সম্পাদন করে থাকে যেটিকে বলা হয় 'কেয়ার প্ল্যান' বা যত্নের দৈনিক পরিকল্পনা। কেয়ার সুপারভাইজার বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই মূলত এই কেয়ার প্ল্যান প্রণয়ন করে থাকেন। ওল্ড হোম, হস্পিস কেয়ার বা হোম কেয়ার সেটিংস; যেখানেই কাজ করুক না কেন, যত্নের দৈনিক এই পরিকল্পনা প্রায় একই রকম। নিম্নে বৃদ্ধাশ্রম বা ওল্ড হোমের জন্য প্রণীত একটি কেয়ার প্ল্যান প্রদান করা হলো যেখান থেকে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান তার নিয়মমাফিক কাজের তালিকা সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করবে।

২.১৩ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধির বাইরের কার্যাবলি

কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে অনেক কিছুই শেখার ও করার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু, কোনো কিছু জানলেই তা প্রয়োগ করতে হবে এমনটি নয়। আগে দেখতে হবে উপরে উল্লেখিত কার্যতালিকার মধ্যে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যস্ত কাজের মধ্যে এটি পড়ে কিনা। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো কেয়ারগিভারের কাজ নয় কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে করে ফেলি, কিংবা করলে রোগীর কোনো ক্ষতি হবেনা বা জবাবদিহিতা করতে হবেনা। নিচে এরকম কিছু কাজের উদাহরণ দেওয়া হলো:

- রোগ নির্নয় করা। এটি কেয়ারগিভারের কোনো অবস্থাতেই করতে যাওয়া ঠিক নয়। এই কাজটি একজন ডাক্তারের। নিজের মত করে, কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে রোগী বা কাউকে কোনো প্রকার ওষধ গ্রহণের উপদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করা যাবে না।

২০২৪

- একজন কেয়ারগিভার হয়তো রোগীর হেল্‌থ স্ক্রিনিং ও ভাইটাল সাইন্‌স পরিমাপের মাধ্যমে কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি করে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সেগুলোকে পর্যালোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বা কাউকে নির্দেশনা দেওয়া যাবে না। এই কাজগুলো সাধারণত ডাক্তার বা নার্সরা করে থাকেন।
- ইনজেকশন প্রদান করা: মনে রাখতে হবে, একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কেবলমাত্র সেল্‌ফ এডমিনিস্টার্ড ইনজেকশন প্রদান করতে পারে; যেমন- ইনসুলিন প্রদান করা। কোনো অবস্থাতেই আইভি বা আইএম ইনজেকশন দেওয়া পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধির মধ্যে পড়েনা।
- ব্লাড স্যাম্পল কালেকশন, ক্যানুলেশন, ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা, স্যালাইন দেওয়া প্রভৃতি কাজ করা যাবে না। এ কাজগুলো নার্স বা ডাক্তাররা করে থাকেন। তবে, উপযুক্ত পেশাদারীর তত্ত্বাবধানে নির্দেশ মোতাবেক সহযোগীতার কাজটি করা যেতে পারে।
- মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রোগীর শরীরে প্রবেশ বা অপসারণ করা: পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান সাধারণত রোগীর শরীরে কোনো প্রকার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট প্রবেশ বা অপসারণ করতে পারবেনা। যেমন: ক্যাথেটার করা, ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব পরানো বা খুলে ফেলা। এতে মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে।
- ইনভেসিব প্রসিডিউর: কোনো প্রকারেই ইনভেসিব কোনো প্রসিডিউর সম্পাদন করা যাবে না। যেমন: ক্ষত সেলাই করা, সেলাই কাটা, ফোঁড়া কাটা, ক্যানুলা করা প্রভৃতি।

২.১৪ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের পেশাদারিত্ব

কর্মক্ষেত্রে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান একজন পেশাদার কেয়ারগিভার হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই পেশাগত পরিচয় সাধারণত একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন (সনদ) অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তবে, একজন পেশাজীবি কেয়ারগিভার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে কেবল প্রশিক্ষণ ও সনদই যথেষ্ট নয়। পেশাদারিত্ব বলতে সাধারণত নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সঠিক আচরণের মাধ্যমে নিজের সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। একজন কেয়ারগিভার তার আচার-আচরণ, যোগাযোগের দক্ষতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ইতিবাচক মনোভাব প্রভৃতির মাধ্যমে পেশাদারিত্বের গুণাবলি ফুটিয়ে তুলতে পারেন সহজেই। এক্ষেত্রে নিচের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য:

- **কর্তব্যজ্ঞান ও জবাবদিহিতা:** নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। একজন অসুস্থ রোগী নিয়ে কাজ করতে হলে সামান্য অবহেলার কারণে অনেক সময় অনেক বড় সমস্যা হয়ে যেতে পারে, এমনকি রোগীর জীবনও চলে যেতে পারে। তাই, কেয়ারগিভার হিসেবে প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে কর্তব্যজ্ঞান প্রয়োগ করে সম্পাদন করতে হবে। কাজের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে নিজেকে জবাবদিহি রাখতে হবে।
- **সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানিবর্তিতা:** উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কেয়ার সুপারভাইজার কর্তৃক নির্দেশিত কেয়ার প্ল্যান অনুযায়ী সময় ও নিয়ম মাফিক কার্যসম্পাদন করতে হবে। এটি কর্মক্ষেত্রে যেকোনো ব্যক্তির পেশাদারিত্বের একটি বড় পরিচয়।
- **সহানুবর্তিতা এবং সহমর্মিতা:** রোগী ও তার স্বজনদের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মিতাসম্পন্ন হতে হবে। কোনো প্রকারেই বিরক্তি বা ঠাট্টা-মশকরা বা হাসাহাসি করা যাবে না।
- **সততা ও বিবেকবোধ:** একজন কেয়ারগিভারকে অবশ্যই সৎ ও বিবেকবান হতে হবে। কোনোভাবেই রোগীর বা তার স্বজনের কোনোকিছু অসৎ উপায়ে আত্মসাৎ করা যাবে না। নিজের লাভের জন্য অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

- **নির্ভরযোগ্যতা:** নির্ভরযোগ্যতা বলতে স্বাস্থ্য সেবা দলের কাছে নিজের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করাকে বুঝায়। সহকর্মীদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কেয়ারগিভারকে কোনো কাজের নির্দেশনা প্রদান করলে সেটি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে কেয়ারগিভার সম্পাদন করতে পারবে।
- **গোপনীয়তা:** রোগীর ও তার পরিবারের চিকিৎসা সম্পর্কিয় তথ্যাবলি গোপন রাখা একটি গুরুদায়িত্ব। কোনোভাবে কোড অব কনডাক্টের বাইরে গিয়ে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা যাবে না।
- **নম্রতা-ভদ্রতা ও সাহায্যের মনোভাব:** কেয়ারগিভারকে নম্র-ভদ্র ও আচরণে শালীন হতে হবে। সাহায্য করার মনোভাব থাকতে হবে; কেননা কেয়ারগিভিং কাজটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ধৈর্য্যের সাথে সম্পাদন করতে হয়।
- **যোগাযোগের দক্ষতা:** যোগাযোগের দক্ষতা পেশাদারী আচরণের একটি বড় নিদর্শন। সঠিকভাবে মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগের পাশাপাশি নিরপেক্ষ শ্রবন কৌশলও এর অন্তর্ভুক্ত।
- **অর্পিত দায়িত্বের বাইরের কাজ না করা:** কেয়ারগিভার তার কার্যপরিধির বাইরের কাজ করবেনা, প্রয়োজন হলে উপযুক্ত পেশাজীবীকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে।
- **প্রবলেম সলভিং স্কিল্‌সঃ** কর্মক্ষেত্রে কেয়ারগিভার নানারকম সমস্যার মুখে পড়তে পারে। যেমন; রোগীর শারীরিক অবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, কিংবা হঠাৎ করে কোনো ওষুধ বা অন্য কোনো সামগ্রীর স্টক ফুরিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। এধরনের যেকোনো পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সমস্যা সমাধানের কার্যকর দক্ষতা একজন কেয়ারগিভারের জন্য অপরিহার্য।

২.১৫ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের আচরণবিধি বা কোড অব কনডাক্ট

- সেবাগ্রহীতা প্রতিটি ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে
- নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য, জ্ঞান ও দক্ষতার সীমানা জানতে হবে
- কেবলমাত্র আইনগতভাবে স্বীকৃত কার্যাবলিই সম্পাদন করতে হবে, এর বাইরে নয়
- কেবলমাত্র সেই কার্যাবলিই সম্পাদন করতে হবে যেগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেটাতে রোগীর ক্ষতি হতে পারে
- নিজের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো ঔষধ গ্রহণ করা যাবে না, কেবলমাত্র চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বা নির্দেশনা অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ করতে হবে
- চিকিৎসক ও নার্স কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে
- নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পলিসি ও প্রসিডিউর মেনে চলতে হবে
- অর্পিত প্রতিটি কাজ নিরাপদ, আরামদায়ক ও যত্নের সাথে সম্পাদন করতে হবে
- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী দলের উপর অনুগত থাকার চেষ্টা করতে হবে
- একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আচরণ করতে হবে
- রোগীর তথ্যাবলির ক্ষেত্রে 'প্রাইভেসি ও কনফিডেনশিয়ালিটি' বজায় রাখতে হবে
- পেশেন্টের জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করতে হবে
- নিজের প্রয়োজনের চেয়েও রোগীর স্বার্থকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে
- নিজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেকেই জবাবদিহি রাখতে হবে।

টেবিল: নমুনা কেয়ার প্ল্যান।

সময়	কাজ
সকাল ৬.৩০-৭ টা	সকালে চা বা অন্যান্য পানীয় প্রদান করবেন।
সকাল ৭-৮টা	নিজে পরিপাটি হয়ে মেম্বারদের সাথে কুশল বিনিময় করা এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁর সমস্যা শুনবেন। সমস্যাটি তখনই সমাধানযোগ্য হলে সমাধান করবেন, না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান করবেন। মেম্বার ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম থেকে উঠাবেন; দাঁত মাজা, হাত মুখ ধোয়া ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করবেন; ইনসুলিন দেবেন ও ওষুধ খাওয়াবেন (ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী), বিছানা তৈরি করে দেবেন, ঘর পরিষ্কার করবেন।
সকাল ৮- ৯:৩০টা	মেম্বারদের নাস্তা ওষুধ খাওয়াবেন।
সকাল ৯:৩০-১১টা	নার্স এবং ফিজিওথেরাপিস্ট তাদের কাজ করবেন এবং কেয়ারগিভারগণ হোম মেম্বারদের হাল্কা নাস্তা পরিবেশন করবেন।
সকাল ১১-দুপুর ১টা	হোম মেম্বারদের গোসল করাবেন, তাদের কাপড় ধোবেন, ফ্লোর পরিষ্কার করবেন, লন্ড্রি সার্ভিস ও রুম ক্লিনিং নিশ্চিত করবেন, ছাদে কাপড় শুকাতে দেবেন, জানলার গ্লাস ও থাই গ্লাস পরিষ্কার করবেন; টেবিল, চেয়ার, আলমারি, শেল্ফ ইত্যাদি পরিষ্কার করবেন; নিজে গোসল করবেন।
দুপুর ১-২টা	মেম্বারদের লাঞ্চ করাবেন, ওষুধ খাওয়াবেন; ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করবেন।
দুপুর ২-৪টা	মেম্বারদের বিশ্রামের সময় এবং কেয়ারগিভারদের ব্যক্তিগত কাজের সময়। এই সময়টায় প্রয়োজনীয় নিজের কাজকর্ম শেষ করবেন।
বিকেল ৪-০: ৪-৩০টা	মেম্বারদের বিকেলের নাস্তা পরিবেশন করবেন।
বিকেল ৪-৫:৩০টা	মেম্বারদের ছাদে পরিভ্রমণ করাবেন, কেউ লাইব্রেরি বা ইনডোরে আগ্রহি হলে তাকে সাহায্য করবেন, শুকাতে দেওয়া কাপড় আনবেন ও মেম্বারকে বুঝিয়ে দেবেন।
বিকেল ৫:৩০-রাত ৮টা	মেম্বারদের সাথে থাকবেন, গল্প করবেন, টিভি দেখবেন। এ সময় মেম্বারদের কোনো কাজ থাকলে সহযোগিতা করবেন।
রাত ৮টা- ৯টা	হোম মেম্বারদের রাতের খাবার খাওয়াবেন, ওষুধ খাওয়াবেন এবং ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করবেন।
রাত ৯- ১০টা	মেম্বারদের সাথে থাকবেন, গল্প করবেন, টিভি দেখবেন, মেম্বারদের বিছানা তৈরি করে দেবেন, জানালা বন্ধ করবেন, দরজা বন্ধ করবেন।
রাত ৯.৩০-১০টা	রাতের প্রয়োজনীয় পথ্য, পানীয় পরিবেশন করবেন।

২.১৬ রোগীর ও নিজের অধিকার

ক্লায়েন্ট বা ব্যক্তি যিনি স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন, তার আছে কিছু মৌলিক অধিকার। যেমন:

- সম্মানজনক উপায়ে উপযুক্ত সেবা-যত্ন বা পরিচর্যা পাবার অধিকার
- সেবার ধরন ও তার মূল্য জানার অধিকার; সেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়ার অধিকার এবং সেবাপ্রদানকারী সম্পর্কে জানার অধিকার
- নিজের শারীরিক-মানসিক সমস্যা ও গৃহীত সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
- সীমাবদ্ধতা এবং অপব্যবহার থেকে মুক্ত থাকার অধিকার
- স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার; অভিযোগ প্রদান ও নিষ্পত্তি পাবার অধিকার
- সেবা কেন্দ্রে ভর্তি, স্থানান্তর ও ছুটির সময়কালীন অধিকার
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার; মর্যাদা, সম্মান এবং স্বাধীনতার অধিকার

২০২৫

এই মৌলিক অধিকারগুলো স্বাস্থ্যসেবার যেকোনো সেটিংসেই মোটামুটি একই রকম। ওল্ড হোমে এগুলোকে বলা হয় রেসিডেন্টস্ রাইট্স বা প্রবীন নিবাসীর অধিকার। সেবাগ্রহীতা রোগী হলে এগুলোকে বলা যায় পেশেন্টস্ রাইট্স বা রোগীর অধিকার; তেমনি হোম কেয়ারের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ক্লায়েন্টস্ রাইট্স। নিজের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে একজন ক্লায়েন্ট, রোগী বা প্রবীন ও তার পরিবার তাদের চাওয়া-পাওয়া মেটাতে সচেষ্ট থাকতে পারেন। ক্লায়েন্ট ও তার স্বজনদেরকে এসকল অধিকার সম্পর্কে অবহিত এবং রক্ষা করা একজন কেয়ারগিভারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বৃদ্ধাশ্রমে নিবাসীর অধিকার সংরক্ষণে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের করণীয়

- কোনো অবস্থাতেই একজন বাসিন্দাকে শারীরিক, মানসিক বা মৌখিক নির্যাতন ও যৌন হয়রানী করা যাবে না। এধরনের নির্যাতন, অপব্যবহার বা অবহেলার (abuse) ঘটনা নজরে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে তা রেকর্ড ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করতে হবে।
- বাসিন্দাকে সে নামে ডাকুন যেটি তিনি পছন্দ করেন।
- সেবা পরিকল্পনায় ক্লায়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করা। কখন, কোথায়, কার মাধ্যমে কোনো সেবাটি ঠিক কিভাবে প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে যথাসম্ভব অবহিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে; যেকোনো সেবা প্রদানের পূর্বেই ক্লায়েন্টকে সেবা পদ্ধতি, এর সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সর্বদা ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে
- অপ্রয়োজনীয় কোনো পদ্ধতি রোগীর শরীরে সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকতে হবে; ক্লায়েন্ট কোনো সেবা গ্রহণ করতে সম্মত না হলে তার পছন্দকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। চিকিৎসা বা সেবা প্রত্যাখ্যান করার আইনগত অধিকার ক্লায়েন্টের আছে এবং এধরনের ক্ষেত্রে কেয়ারগিভারের উচিত হবে সম্মান জানানো এবং উর্ধ্বতনকে অবহিত করা।
- একজন বাসিন্দার প্রশ্ন থাকলে নার্সকে বলুন, উদ্বেগ বা চিকিৎসা সম্পর্কে অভিযোগ বা যত্নের লক্ষ্য।
- কোনো কিছু রেকর্ড ও রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে অবশ্যই যত্নশীল ও সত্যবাদি হতে হবে।
- ক্লায়েন্টের কোনো বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা করা যাবে না এবং গোপনীয়তা ভঙ্গ করা যাবে না।
- ক্লায়েন্টের কক্ষে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং প্রস্থানের সময় অবহিত করতে হবে; ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কোনো উপহার বা টাকা গ্রহণ করা যাবে না; কোনো ক্লায়েন্টের গোপন কোনো তথ্য অনুমতি ব্যতিত দেখা ও বিতরণ করা যাবে না।

২.১৭ কেয়ারগিভারের অধিকার

একজন পেশাজীবী হিসেবে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানেরও আছে কিছু মৌলিক অধিকার। যেমন:

- নিজের যত্ন নেয়ার অধিকার; সঠিক খাবার, শারীরিক ব্যায়াম ও যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম নেয়ার।
- আন্তর্জাতিক শ্রম আইনানুযায়ী কর্মঘণ্টা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার এবং এর বাইরের কোনো অতিরিক্ত সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার।
- কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাবার অধিকার; যেকোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হওয়ার কিংবা মুক্তি পাওয়ার অধিকার।
- কেয়ার এজেন্সি, কো-ওয়ার্কার, পেশেন্ট পার্টি বা রোগীর স্বজন কর্তৃক অন্যায়ভাবে কোনো নির্যাতনের শিকার হলে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার।
- নিজের পছন্দমত জীবনের সেই দিকগুলো পরিচালনা করার অধিকার যেগুলোর সাথে রোগীর সেবা বা কেয়ারগিভিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই।

- নিজের অনুভূতির যথাযথ বহিঃপ্রকাশের অধিকার।
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার।
- পেশাজীবি সংঘটন করা বা সংঘটনের কর্মকান্ডে যুক্ত হবার অধিকার।
- ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নতি সাধনের সুযোগ পাবার অধিকার।

২.১৮ দেশ ও বহির্বিশ্বে কেয়ার গিভিং এর সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে কেয়ারগিভারের চাহিদা ব্যাপকহারে বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা মহামারিতেও এটার গুরুত্ব ব্যাপক হারে উপলব্ধি করা গেছে। উন্নত প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবার ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এটি ৭২.৮ বছর। এর মধ্যে পুরুষের গড় আয়ু ৭১.২ বছর আর নারীর গড় আয়ু ৭৪.৫ বছর (তথ্যসূত্রঃ বিবিএস ২০২০)। উন্নত বিশ্বে গড় আয়ু আরো বেশি। লক্ষণীয় যে, যে দেশের অর্থনীতি যত বেশি উন্নত সে দেশের গড় আয়ু সাধারণত তত বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অতি সম্প্রতি স্বল্প উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। যার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি গতিশীল হচ্ছে। এর সাথে বেড়ে যাচ্ছে মানুষের গড় আয়ু। এ অবস্থায় বাংলাদেশেও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধাশ্রম ও হোম কেয়ারের চাহিদা। পাশাপাশি হাসপাতালে দীর্ঘমেয়াদী সেবা লাভ করছে এমন রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই বর্ধিত চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারের বিকল্প নেই। এর সাথে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বাইরেও কেয়ারগিভার হিসেবে কাজ করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে জাপান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এই চাহিদার শীর্ষে।

দেশ	গড় আয়ু (বছর)
জাপান	৮৩.৭
নরওয়ে	৮২.৪
আয়ারল্যান্ড	৮২.৩
সুইজারল্যান্ড	৮৩.৮
জার্মানি	৮১.৩
অস্ট্রেলিয়া	৮৩.৪
হল্যান্ড	৮২.৩

চিত্র: কয়েকটি দেশের নারী ও পুরুষের গড় আয়ু

নিম্নে কেয়ারগিভারের কিছু সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হলো:

- দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন একটি পেশা এটি।
- ভালো বেতন, সম্মানজনক পেশা হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে কেয়ারগিভিং একটি সম্ভাবনাময় খাত।
- হোম কেয়ারের পাশাপাশি বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারের চেম্বার, বৃদ্ধাশ্রম, ডে কেয়ার সেন্টার, নার্সিং হোম, প্যারালাইসিস সেন্টার সমূহে চাকরির সুযোগ।
- কেয়ার গিভার প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ আছে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝায়?
২. প্রিফিক্স,রুট ও সাফিক্স কি? উদাহরণসহ লিখ।
৩. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কয়েকটি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
৪. গৃহে রোগীর পরিচর্যা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ১০ টি সরঞ্জামের নাম উল্লেখ কর।
৫. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৬. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৭. কেয়ারপ্ল্যান বলতে কি বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্যের কয়টি দিক রয়েছে? কি কি? সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
২. হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের নাম ও প্রদায়িত সেবাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৩. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের ৬ টি আচরণবিধি উল্লেখ কর।

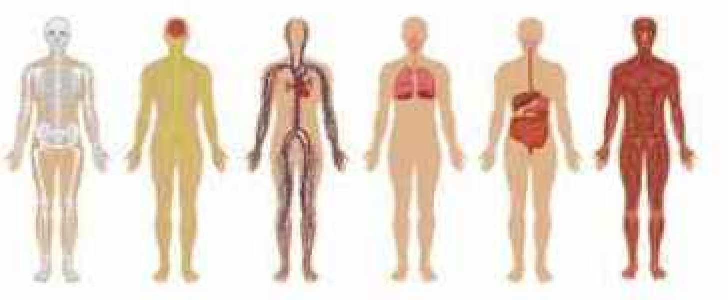
রচনামুলক প্রশ্ন

১. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের পেশাদারিত্বের মূলনীতিগুলো কী কী? সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
২. স্বাস্থ্য সেবাখাতে নিজের ও রোগীর অধিকার বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ লিখ।
৩. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর ব্যবহার

Basic Human Biology



সেবাদানের জন্য মানব শরীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। দেহের গঠন, কার্যপ্রণালী, গুরুত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্ত্রসমূহের জ্ঞান, সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা অনুযায়ী কাজের পরিধি ও পরিকল্পণা করার পূর্ব শর্ত। এ অধ্যায়ে আমরা মানব শরীরের গঠন, অঙ্গ পরিচিতি, তন্ত্রের কাজ ও গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীববিজ্ঞানের শাখাসমূহ উল্লেখ করতে পারব।
- জীববিজ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- দেহতত্ত্বে ব্যবহৃত শব্দগুলো বলতে পারব।
- জীবকোষের গঠন ও কাজের সচিত্র বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার প্রাণী টিস্যুর নাম, গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- মানব দেহের গুরুত্বপুর্ণ অস্থিসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- মানব দেহের গুরুত্বপুর্ণ পেশীসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- হৃৎপিন্ডের গঠন ও রক্তসংবহন বর্ণনা করতে পারব।
- মানব দেহের গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারব।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা মানবকোষের বিভিন্ন অঙ্গানু শনাক্ত করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৩.১ জীববিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকৃতিকে যে মূল দুই ধারায় বিশ্লেষণ করা হয় তা হল, জীব ও জড় পদার্থ। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের সার্বিক বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জীববিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞানের এই প্রাচীনতম শাখায় উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এদের গঠন, কার্যকারিতা, কার্যকৌশল পদ্ধতি বা জৈবনিক ক্রিয়া, পুষ্টি ও প্রজনন সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। ইংরেজিতে জীববিজ্ঞানকে Biology বলা হয়, যা ল্যাটিন শব্দ Bios অর্থাৎ জীবন; Logos অর্থাৎ জ্ঞান এর সমন্বয়ে তৈরি।

৩.১ জীববিজ্ঞানের শাখাসমুহ

জীবের ধরনভেদে প্রধান দুই শাখায় বিভক্ত: উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান। এছাড়াও এমন অনেক জীব আছে যা উদ্ভিদ বা প্রাণী কোনোটাই না। যেমন: ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। তাই বৈশিষ্টের ভিত্তিতে আবার ভৌত জীববিজ্ঞান ও ফলিত জীববিজ্ঞান এই দুই ভাগে বিভক্ত।

৩.১.১ ভৌত জীববিজ্ঞান: জীববিজ্ঞানের তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

১. অঙ্গসংস্থান (Morphology) সার্বিক দৈহিক বর্ণনা ২. শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যা (Taxonomy) শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মনীতি ৩. শরীরবিদ্যা (Physiology) শরীরবৃত্তীয় কাজের বিবরণ ৪. হিস্টোলজি (Histology) আনুবিক্ষণিক গঠন, বিন্যাস, কার্য	৫. ভ্রূণবিদ্যা (Embryology): ভ্রূনের পরিস্ফুরন ৬. কোষবিদ্যা (Cytology): কোষের যাবতীয় বিষয় ৭. বংশগতিবিদ্যা (Genetics): জিন ও বংশগতিধারা ৮. বাস্তুবিদ্যা (Ecology): পরিবেশ ও জীবের আন্তঃসম্পর্ক

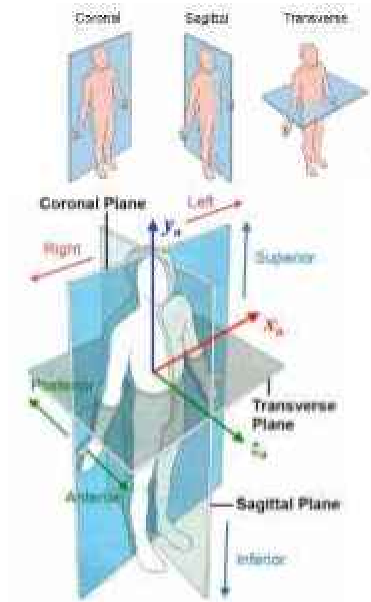
৩.১.২ ফলিত জীববিজ্ঞান: প্রায়োগিক বিষয়সমুহ-

১. জীবপ্রত্নতত্ত্ব (Paleontology)
২. জীব পরিসংখ্যান বিদ্যা (Biostatistics)
৩. পরজীবীবিদ্যা (Parasitology)
৪. কীটতত্ত্ব (Entomology)
৫. অণুজীববিদ্যা (Microbiology)
৬. প্রাণরসায়ন (Biochemistry)
৭. চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science)
৮. জীব প্রযুক্তি (Biotechnology)
৯. ফার্মেসি (Pharmacy)
১০. বন বিজ্ঞান (Forestry)

৩.২ দেহতত্ত্ব (Anatomy) ও শরীরতত্ত্ব (Physiology) সংক্রান্ত পরিভাষা

৩.২.১ দেহতত্ত্ব বা (Anatomy) ব্যবহৃত শব্দাবলি

- **দেহতত্ত্ব বা (Anatomy)**- মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান।
- **সামগ্রিক দেহতত্ত্ব (Gross Anatomy)**- মানবদেহের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান যা খালি চোখে দেখা যায়।
- **স্থানিক দেহতত্ত্ব (Regional Anatomy)**- মানবদেহের এক একটি অংশ বা স্থানের বিভিন্ন ভাগের বর্ণনা। যেমন- মাথা ও গলা (Head-Neck), উর্ধাঙ্গ (Upper Limb), নিম্নাঙ্গ (Lower Limb) ইত্যাদি।
- **তন্ত্রীয় দেহতত্ত্ব (Systemic Anatomy)**- মানবদেহের এক একটি তন্ত্রের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- শাসনতন্ত্র (Respiratory System), পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) ইত্যাদি।
- **আণুবীক্ষণিক দেহতত্ত্ব (Histology)**- মানবদেহের ক্ষুদ্র অঙ্গসমূহের গঠন যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscopic) এর সাহায্যে দেখা যায়। যেমন- কোষের গঠন, কলার গঠন প্রভৃতি।
- **সাধারণ শরীরতত্ত্ব (General Physiology)**- মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও জীব কোষের মৌলিক গঠন, উৎপত্তি, বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভৌতিক ও রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান।



চিত্র ৩.১: দৈহিক অবস্থান, দৈহিক তল

- **অস্থি বিদ্যা (Osteology)**- হাড় (Bone) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- হিউমেরাস, ফিমার, রেডিয়াস ও আলনা, টিবিয়া, ফিবুলা, কশেরুকা ইত্যাদি।
- **সন্ধি বিদ্যা (Arthrology)**- মানবদেহের বিভিন্ন সন্ধি (Joint) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- স্কন্ধ সন্ধি (Shoulder Joint), জঙ্ঘা সন্ধি (Hip Joint), কনুই সন্ধি (Elbow Joint) ইত্যাদি।
- **পেশি বিদ্যা (Myology)**- পেশি সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- বাহুর পেশি (Biceps), হৃদপেশি (Cardiac Muscle)।
- **রক্তরোগ বিদ্যা (Haematology)**- রক্তরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **যকৃতরোগ বিদ্যা (Hepatology)**- যকৃত রোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **চর্মরোগ বিদ্যা (Dermatology)**- চর্মরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **স্নায়ুরোগ বিদ্যা (Neurology)**- স্নায়ুরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **হৃদরোগ বিদ্যা (Cardiology)**- হৃদরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **স্ত্রীরোগ বিদ্যা (Gynaecology)**- স্ত্রীরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **মূত্ররোগ বিদ্যা (Urology)**- মূত্র ও মূত্ররোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

- **দৈহিক অবস্থান (Anatomical Position)**- একজন মানুষ হাত, পা, সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে তার যে ভঙ্গিমা হয় তাকে দৈহিক অবস্থান (Anatomical Position) বলে। দেহতত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য কতকগুলো কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেহকে ভাগ করা হয়ে থাকে।
- **মধ্যমা তল (Median Plane)**- একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে ডান ও বাম সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে।
- **তীর্যক তল (Sagittal Plane)**- একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা দেহের মধ্যমা তলের সমান্তরালভাবে অতিক্রম করেছে।
- **কিরীট তল (Coronal Plane)**- একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা দেহের মধ্যমা তলের সমকোণে অতিক্রম করে দেহকে সামনে এবং পিছনে দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে।
- **অনুভূমিক তল (Transverse Plane)**- একটি কাল্পনিক তল যা দেহের মধ্যমা ও কিরীট তলকে সমকোণে অতিক্রম করে দেহকে উপর এবং নিচ দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে।
- **মধ্যমাবর্তী (Medial)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা মধ্যমাবর্তী তলের নিকটবর্তী অঙ্গকে মধ্যমাবর্তী অঙ্গ বলে। যেমন- আলনা (Ulna) হাড়টি রেডিয়াস (Radius) হাড় থেকে মধ্যমাবর্তে (Medially) অবস্থিত।
- **পার্শ্ববর্তী (Lateral)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা মধ্যমা তলের দূরের অঙ্গকে বলা হয় পার্শ্ববর্তী (Lateral)। যেমন- হাতের রেডিয়াস (Radius) হাড়টি আল্না (Ulna) থেকে পার্শ্ববর্তী (Laterally) অবস্থানে রয়েছে।
- **অভ্যন্তরীণ (Internal)**-দেহের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত যে কোনো অঙ্গ আভ্যন্তরীণ অঙ্গ (Internal Organ) যেমন- পিত্ত থলি (Gallbladder)।

- **বাহ্যিক (External)**- দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত অঙ্গসমূহকে বাহ্যিক অঙ্গ (External Organ) বলে। যেমন- ত্বক (Skin)।
- **উর্ধ্ববর্তী (Superficial)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা দেহের উপরিভাগ থেকে কল্পনা করলে যেটা উপরিভাগের কাছে অবস্থিত তাকে উর্ধ্ববর্তী অঙ্গ (Superficial Organ) বলা হয়। যেমন- বাহুর মাংশ পেশি হাড়ের উর্ধ্ববর্তে অবস্থিত।
- **গভীর (Deep)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা দেহের গভীরে বা ভেতরে অবস্থিত অঙ্গসমূহকে গভীরের অঙ্গ (Deep Organ) বলা হয়। যেমন- বাহুর হাড় মাংশ পেশির গভীরে অবস্থিত।
- **সম্মুখবর্তী (Anterior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা সামনের দিকের অবস্থান প্রকাশ করে। যেমন- নাক কানের থেকে সম্মুখবর্তী (Anterior)।
- **পশ্চাৎবর্তী (Posterior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা দেহের পিছনের দিকের অবস্থান প্রকাশ করে। যেমন- কান নাকের থেকে পশ্চাৎবর্তী (Posterior)।
- **উপরে (Superior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান দেহের মাথার নিকটবর্তী অঙ্গের অবস্থান প্রকাশ। যেমন- হৃদপিণ্ড ব্যবচ্ছেদ পেশির (Diaphragm) উপরে অবস্থিত।
- **নিচে (Inferior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান দেহের পায়ের নিকটবর্তী অঙ্গের অবস্থান প্রকাশ করে। যেমন- ব্যবচ্ছেদ পেশি (Diaphragm) হৃদপিণ্ডের নিচে অবস্থিত।
- **এক দিকে (Ipsilateral)**-দেহের একই পার্শে অবস্থিত অঙ্গ। যেমন- ডান হাত এবং ডান পা দেহের একই দিকে অবস্থিত।
- **বিপরীত দিকে (Contralateral)**-দেহের বিপরীত পাশে অবস্থিত অঙ্গ। যেমন- ডান হাত এবং বাম হাত দেহের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

৩.২.২ এনাটমির বর্ণনার জন্য পেটকে চারটি কাল্পনিক লাইন দিয়ে মোট নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১) ডান উল্লম্ব তল (Right Vertical Plane)- এই তলটি ডান স্তনবৃন্তের সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।
২) বাম উল্লম্ব তল (Left Vertical Plane)- এই তলটি বাম স্তনবৃন্তের সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।
৩) পাইলোরাসের মধ্যতল (Transpyloric Plane)- এটি সামনের পাজড়ার বরাবর আড়াআড়ি তল।
৪) টিউবারকুলের অন্তর্বর্তী তল (Inter Tubercular Plane)- বস্তির দুইটি প্রধান হাড় (Pelvic Bone) এর সামনের পয়েন্ট বা Anterior Superior Iliac Spine- এর সংযোগ লাইন।

এর ফলে পেট যে নয়টি ভাগে বিভক্ত হয়-

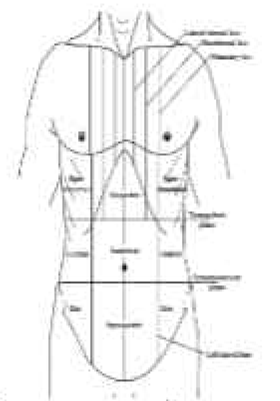
ক) উপরের তিনটি ভাগ

১) ডান হাইপোকোনোড্রিয়াক (Right Hypochondriac),
২) ইপিগ্যাসট্রিক (Epigastric) ও
৩) বাম হাইপোকোনোড্রিয়াক (Left Hypochondriac)

খ) মাঝের তিনটি ভাগ:

৪) ডান লাম্বার (Right Lumber)
৫) আম্বিলিক্যাল (Umbilical) ও
৬) বাম লাম্বার (Left Lumber)।

গ) নিচের তিনটি ভাগ



চিত্র ৩.২: বুক ও পেটের ভাগ সমূহ

৭) ডান ইলিয়াক (Right Iliac)
৮) হাইপোগ্যাস্ট্রিক (Hypogastric) ও
৯) বাম ইলিয়াক (Left Iliac) এই ভাগ অনুযায়ী পেটের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের অবস্থান ও রোগের লক্ষণ বুঝতে সুবিধা। হয়।

৩.৩ দেহের মৌলিক গঠন

কোষ (Cell) মানব দেহের গঠনের ও কাজের একক (Unit) একই উৎস থেকে উদ্ভূত, একই আকৃতির বা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো (cells) যখন মিলিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে তখন সমষ্টিগত কোষকে একত্রে কলা (Tissue) বলা হয়। দুই বা ততধিক ধরনের কলা একত্রিত হয়ে তৈরি হয় এক একটি অঙ্গ (Organ); যেমন হৃৎপিণ্ড (Heart), ফুসফুস (Lung), বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি।

এছাড়াও মানবদেহকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ৫টি এলাকায় (Region) ভাগ করা হয়

১) মাথা এবং গলা বা (Head & Neck),
২) বুক বা (Chest or Thorax),
৩) পেট বা (Abdomen),
৪) হাত বা (Superior Extremity) এবং
৫) পা বা (Inferior Extremity)

১) **মাথা**র ভাগ- ক) মস্তিষ্ক বা (Cranium) এবং খ) মুখ বা (Face)

২) **বুক** বা Thorax এ প্রধান অঙ্গসমূহ - ক) হৃদপিণ্ড বা (Heart) খ) দুইটি ফুসফুস বা (Lungs) গ) শ্বাসনালী বা (Trachea) ও বায়ুনালী বা (Bronchi), ঘ) অন্ননালী বা (Oesophagus) হৃদপিণ্ড বা Heart থাকার কারণে ফুসফুস দুইটি বা Lungs এর মাঝে যে গর্ত হয় তার নাম বক্ষ গহবর বা Mediastinum এ ছাড়া সব শিরা ও ধমনীর উৎস মুখে এই বক্ষ গহ্বরে অবস্থিত। ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm উপরের দিকে বেঁকে থাকে এবং বুক ও পেটকে ভাগ করে।

৩) **পেট** বা Abdomen এর অবস্থান ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm এর নিচে। এর প্রধান দুইটি অংশ- i) উপরের পেট ও ii) তলপেট।

পেটের উপরের অংশে আছে:

ক) পাকস্থলী বা Stomach,
খ) ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র বা Intestines,
গ) যকৃৎ বা Liver,
ঘ) প্লীহা বা Spleen,
ঙ) পিত্তকোষ বা Gall Bladder
চ) অগ্নাশয় বা Pancreas
ছ) বৃক্ক বা Kidney এবং
জ) মহাধমনী (Aorta) ও নিম্ন মহাশিরা (Inferior Vena Cava

পেটের নিচের অংশ বা বস্তিকোটরের (Pelvic Cavity) অঙ্গসমূহ-

ক) মুত্রথলি বা Urinary Bladder,
খ) জনন অঙ্গসমূহ বা Reproductive Organs এবং
গ) বৃহদন্ত্রের অংশ বা Colon & Rectum

৪) **হাতে**র ভাগ- ক) উর্ধ বাহু বা (Arm) খ) সম্মুখ বাহু বা (Forearm) গ) কব্জি বা (Wrist) ঘ) করতল বা (Palm) এবং ঙ) হাতের আঙ্গুল বা (Finger) ৫) **পায়ে**র ভাগ- ক) উরু বা (Thigh) খ) নিম্ন পা বা (Leg) গ) চরণ বা (Foot) এবং ঘ) পায়ের আঙ্গুল বা (Toe)

৩.৩.১ জীবকোষ (Cell):

কোষ একটি জীবদেহের গঠন ও কার্যপ্রণালির একক, যা বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দ্বারা আবৃত এবং যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। মানবদেহ প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ থাকে। এই কোষের আকার সাধারণত ৫ - ৫০ মাইক্রোমিটার (m) পর্যন্ত হয়। নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে

কোষ দুই ধরনের। কাজের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের হয়।

১) **দেহ কোষ (Somatic cell)** মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। উদাহরণ-যকৃৎ কোষ (Hepatocyte), ত্বকের কোষ (Epithelial cell)। এদের মধ্যে কিছু কোষ প্রাথমিক পরিপক্কতা লাভের পর আর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না। উদাহরণ- স্নায়ু কোষ (Nerve cell বা Neuron), হৃৎপেশি কোষ (Cardiac myocyte)

২) **জনন কোষ (Gametic cell)** মিয়োসিস পদ্ধতিতে পুং ও স্ত্রী জনন কোষে বিভক্ত হয়। এদের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা, দেহ কোষের অর্ধেক হয়। পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট কোষকে জাইগোট (Zygote) বলে।

ক) আদি বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell):

- সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না
- নিউক্লিয়াস পর্দা বেস্টিত থাকে না
- নিউক্লিয়বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে
- মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে না
- রাইবজোম থাকে
- ক্রোমোজমে কেবল DNA অথবা RNA থাকে।
  উদাহরণঃ নীলাভ শৈবাল, ব্যাক্টেরিয়া

খ) প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell)

- সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে
- নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়বস্তু পর্দা বেস্টিত থাকে
- ক্রোমোজমে DNA, হিস্টোন অথবা অন্যান্য উপাদান থাকে।
- রাইবজোম থাকে না; উদাহরণ: রক্তনালির অন্তঃস্তরের কোষ (Endothelium)

৩.৩.২ কোষের অঙ্গাণু

ইলেকট্রন অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যত প্রানী কোষের অঙ্গাণুসমূহ হল-

প্রোটোপ্লাজম: কোষের ভিতর অবস্থিত অর্ধস্বচ্ছ, জেলির মত বস্তু হল প্রোটোপ্লাজম। কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস নিয়ে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয়।

কোষ আবরণী (Cell Membrane): প্রোটোপ্লাজম যে ত্রিস্তর বিশিষ্ট স্থিতিস্থাপক পর্দা দ্বারা বেষ্টিত তাকে কোষ আবরণী (Cell Membrane) বলে। এটি মূলত লিপিড ও প্রেটিন দিয়ে তৈরি। কোষঝিল্লির ভাঁজকে মিক্রোভিলাই বলে। এই পর্দা বৈষম্যভেদ্য হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি, লবন, পরিপোষক পদার্থ ও বর্জ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কোশগুলো থেকে পৃথক রাখা। এই আবরণের পুরুত্ব ৭.৫ থেকে ১০ ন্যানোমিটার (৭.৫ থেকে ১০ nm)।

কোষ আবরণীর কাজ

- কোষ অভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে রক্ষা করা ও আবৃত রাখা এর প্রধান কাজ।
- বিভিন্ন কোষাঙ্গাণু তৈরিতে সহায়তা করা, যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, নিউক্লিয়ার পর্দা প্রভৃতি
- কোষের সঠিক আকৃতি প্রদান করা।
- অভিস্রবণ বা ব্যাপনের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে কোষের অভ্যান্তরে নেয়া ও কোষ থেকে বের করা।
- ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) ও পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত বড় বস্তুকে কোষের ভিতরে নেয়া।

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm): কোষের প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে নিলে যে জেলির মত বস্তু রয়ে যায় তা সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের সকল অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমে থাকে। এই অঙ্গাণুগুলোর

২০১৫

আবরণী বেষ্টিত হওয়া বা না হওয়ার উপর ভিত্তি করে এদের আবরণীযুক্ত এবং আবরণীবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুতে ভাগ করা হয়।



চিত্র ৩.৩: প্রাণী কোষ ও এর অঙ্গাণু

৩.৩.৩ আবরণীযুক্ত সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

১. **মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)** এটি শ্বসনে অংশগ্রহণকারী, দ্বিস্তরের আবরণী বিশিষ্ট একটি অঙ্গাণু। এর ভিতরের স্তরটি আঙ্গুলের মত ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে, যাকে ক্রিস্টি (Cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বৃন্তযুক্ত গোলাকার বস্তু অবস্থিত, এদের অক্সিজোম (Oxisomes) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচক বা (Enzymes) সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর ম্যাট্রিক্স (Matrix) থাকে। শ্বসনের যে মূল চারটি (ক্রমানুসারে গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেব্‌স চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্র) ধাপ রয়েছে। যদিও প্রথম ধাপ, গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ায় না ঘটলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব কোষেই মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। যেমন Trichosangs, Morocercouomoides ইত্যাদি প্রোটোজোয়াতে এবং মানবদেহের লহিত রক্ত কনিকাতে মিটকন্ড্রিয়া থাকে না।

২. **গলজি** বস্তু **(Golgi body):** গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায় ও কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভিদকোষেও দেখা যায়। এটি সিস্টার্নি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিয়ে তৈরি।

৩. **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)** সাইটোপ্লাজমের ভিতরে জালের মত বিস্তৃত, নিউক্লিয় পর্দার সাথে সংযুক্ত অঙ্গানু এটি।

৪. **কোষগহবর (Vacuole)** সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে ফাঁকা দেখা যায়, সেগুলোই কোষগহবর। বৃহৎ কোষগহবর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। প্রাণিকোষে কোষগহবর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, থাকলেও সেগুলো আকারে ছোট হয়।

৫. **লাইসোজোম (Lysosome)** ক্ষুদ্র আবরণীযুক্ত অঙ্গাণু।

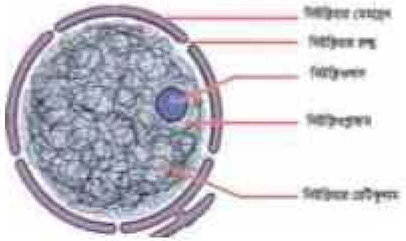
৩.৩.৪ আবরণীবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

১. **কোষকঙ্কাল (Cytoskeleton):** কোষআবরণীর ভিতরে লম্বা এবং মোটা-চিকন মিশিয়ে অসংখ্য দড়ির মধ্যে বস্তু যা কোষের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিউলিন ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে যথাক্রমে মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট দিয়ে কোষকঙ্কালের বিভিন্ন ধরনের তন্তু নির্মিত হয়।

২. **রাইবোজোম (Ribosome)** এই আবরণীবিহীন অঙ্গাণু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে থাকে।

৩. **সেন্ট্রোজোম Centrosome):** প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বাস্তকার বস্তু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে। সেন্ট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার তৈরি করে।

৪. **নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus):** জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট পর্দা ঘেরা ক্রোমোজোম বহনকারী সুস্পষ্ট যে বস্তুটি দেখা যায় তা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এটি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকায়। সিভকোষ এবং লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।



নিউক্লিয়াসের কাজ-

- নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট নিহিত থাকে।
- কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সুগঠিত নিউক্লিয়াসে নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

ক. নিউক্লিয়ার আবরণী (Nuclear membrane): নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখা যে আবরণী, তাকে নিউক্লিয়ার আবরণী বা কেন্দ্রিক আবরণী বলে। এটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এই আবরণী লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এতে কিছু ছিদ্র থাকে, যাকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। নিউক্লিয়ার আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য বস্তুকে পৃথক রাখা এবং বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm): নিউক্লিয়ার ঝিল্লির ভিতরে জেলির মধ্যে বস্তু বা রস থাকে। একে নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজমে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

গ. নিউক্লিওলাস (Nucleolus): নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রং অগ্রাহী অংশের সাথে এক্স লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। এরা রাইবোজোম সংশ্লেষণ করে।

ঘ. ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum): কোষের বিশ্রামকালে অর্থাৎ যখন কোষ বিভাজন চলে না, তখন এই ক্রোমাটিনকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো জট পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। ক্রোমাটিন মূলত DNA এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত জটিল কাঠামো। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা এবং খাটো হয়, তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বংশগতির গুণাবলি বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যায়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নির্দিষ্ট।

৩.৩.৫ কোষের কাজ

১) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং হজম করা (Ingestion and Assimilation)- এর মাধ্যমে কোষ তার প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid), লবণ (Salt) প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে ও পরিত্যাজ্য অংশ ত্যাগ করে।

২) বৃদ্ধি, মেরামত বা ক্ষয়পূরণ (Growth and Repair)- প্রতিটি কোষের মধ্যে নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয়। গঠনমূলক কাজ (Anabolism) দ্বারা কোষের ক্ষয়পূরণ বা মেরামতের কাজ হয়ে থাকে।

৩) বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism)- প্রতিটি কোষের কাজ করার জন্য চাই শক্তি (Energy)। খাদ্যের কণা যে প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায় তাকে ভঙ্গ প্রক্রিয়া (Catabolism) বলে। এরপর খাদ্য কণাগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক কাজ করে ও তাপ সৃষ্টি করে। একে (Anabolism) বলা হয়। এই দুইটি প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে বলা হয় বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism)।

৪) শ্বসন (Respiration): ফুসফুস যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মাধ্যমে। প্রতিটি কোষ পর্যন্ত তা পৌছায় এবং কোষগুলো এই অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার কোষ থেকে নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা CO_2 শিরা দ্বারা বাহিত হয়ে যায় হৃদপিন্ডে। তারপর তা ফুসফুস থেকে প্রশ্বাসের সঙ্গে বেড়িয়ে যায়।

৫) দূষিত পদার্থ ত্যাগ (Excretion) – শরীরের ত্যাজ্য বা বিষাক্ত পদার্থ কোষগুলো থেকে বেরিয়ে রক্তে মিশে যায়। তারপর তারা নানা পথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের ত্যাজ্য পদার্থ যে সমস্ত পথে দেহ থেকে বের হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- ক) বায়বিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয় ফুসফুস থেকে নাকের ছিদ্র পথে।
- খ) তরল পদার্থ বের হয় বৃক্ক বা Kidney দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে যা মানবদেহের ছাকনির কাজ করে
- গ) কঠিন ত্যাজ্য পদার্থ বের হয় মলাশয় বা Colon দিয়ে পায়খানার সঙ্গে আবর্জনা রূপে।

৬) উত্তেজনা ও সঞ্চালন (Irritability and Conductivity) – প্রতিটি কোষ হলো কর্মক্ষম। যে কোনো রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়াজনিত তাপ, চাপ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, আঘাত প্রভৃতিতে কোষগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবার কখনও কখনও এটি সংকুচিত হয় যেমন মাংশ পেশীর তন্তু বা Muscle Fibre হাঁটা-চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও বা বার্তা বয়ে নিয়ে যায় বা সঞ্চালন করে। যেমন- স্নায়ুতন্তু বা Nerve Fibre স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মত ছড়িয়ে থাকে। যেকোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেয়। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে।

৭) প্রজনন (Reproduction) - একটি কোষ ভেঙে দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। এর মূল হলো সেন্ট্রোসোম (Centrosome) এর কাজ। সেন্ট্রোসাম দুভাগে ভাগ হয় ও সেই সঙ্গে নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর চেহারার পরিবর্তন ঘটে।.তারপর দুটি কোষের মধ্যে একটি স্তর (Layer) পড়ে ও দুটি নিউক্লিয়াসে দুইটি সেন্ট্রোসোম দেখা যায়।। একটি নিউক্লিয়াসে ক্রোমজমের সংখ্যা মোট ৪৬টি। যখন কোষ বিভাজন হয় তখন দেখা যায় প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ৪৬টি করেই ক্রোমজম আছে। তা থেকে এটা বুঝতে পারা যায় যে, প্রতিটি ক্রোমজম দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত রয়েছে। এ ভাবে কোষ বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা (Mitosis)। এছাড়া আর এক ধরনের কোষ বিভাজন হলো পরোক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা (Meiosis)। এটি সাধারণত জনন অঙ্গেই হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভাজন শেষে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩টি করে ক্রোমজম থাকে। এর ফলে পুং ও স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয়। এদের নিষিক্তের মাধ্যমে জাইগোট হয়।

৮) মানব দেহের তিন ধরনের রক্তকোষের মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত কণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। অণুচক্রিকা শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে।

৯) ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

১০) মাথার ত্বকীয় কোষগুলো থেকে চুল গজিয়ে থাকে।

১১) অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা, দেহের আকার, গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩.৪ প্রাণিটিস্যু

একই ভ্রূণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছু কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্তু তৈরি করে। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা একেক ধরনের কোষ। এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু বা রক্ত নামক টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত, দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শরীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

৩.৪.১ প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ

প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্টের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়— আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু।

৩.৪.১.১ আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

এই টিস্যুর কাজ হলো- অঙ্গকে আবৃত রাখা (Lining), বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা (Protection) করা, প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ (secretion) করা, বিভিন্ন পদার্থ শোষণ (absorption) করা এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহণ (transcellular transport)। আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি বিভিন্ন পর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে এর অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যেমন-

i. **স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু (Squamous Epithelial):** এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। যেমন- বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। এই টিস্যু প্রধান আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।

ii. **কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু (Cuboidal Epithelial):** এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান। যেমন- বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা। এই টিস্যু প্রধান পরিশোষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত থাকে।

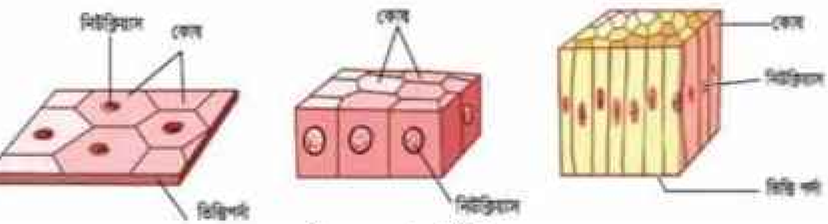
iii. **কলামনার আবরণী টিস্যু (Columnar Epithelial):** এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা। যেমন- প্রাণীর অন্ত্রের আন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো মূলত ক্ষরণ, রক্ষণ এবং শোষণ কাজ করে থাকে।

প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. **সাধারণ আবরণী টিস্যু:** ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একত্রে সজ্জিত। যেমন- বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর।

ii. **স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু:** ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। উদাহরণস্বরুপ:মেরুদন্ডী প্রাণীদের ত্বক। বিশেষ এমন স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু আছে যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে। একে বলে ট্রানজিশনাল আবরণী। যেমন- মুত্রথলির আন্তঃপ্রাচীর।

iii. **সিউডো-স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু:** এই টিস্যু কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একত্রে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। যেমন- ট্রাকিয়া।



চিত্র ৩.৪: আবরণী টিস্যু

৩.৪.১.২ গ্রন্থি বা Gland

গ্রন্থি বা Gland হলো নিঃসরণের যন্ত্র (Secretory Organ) যা দেহের বিভিন্ন স্থানে থাকে। যেমন- যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas), পিত্তথলি (Gall Bladder), পাকস্থলী (Stomach) প্রভৃতি। ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থিগুলো প্রধানত ২টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) বা নালীযুক্ত গ্রন্থি (Gland with duct)- যে সব গ্রন্থি এর রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরে বহন করে নিঃসরণ করে। এদের নিঃসৃত রস বা জুস (Juice) নামে পরিচিত। যেমন- লালা গ্রন্থি (Salivary Gland), যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas) প্রভৃতি।

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland) বা নালীবিহীন গ্রন্থি (Ductless Gland)- যে সব গ্রন্থি নালীবিহীন, এদের নিঃসরণ সরাসরি রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় । যেমন- পিটুইটারী (Pituitary), থাইরয়েড (Thyroid), এড্রিনাল (Adrenal) প্রভৃতি। নিঃসরণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গ্রন্থিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

  ১। শ্লেষ্মা গ্রন্থি বা (Mucous Gland)- এইগুলো শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। যেমন- জিহ্বার নিচে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (sublingual Gland)।

  ২। সেরাস গ্রন্থি বা (Serous Gland)- এগুলো পাতলা জলীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। যেমন:- অগ্নাশয় (Pancreas), প্যারোটিড লালা গ্রন্থি (Parotid Salivary Gland)।

  ৩। মিশ্র গ্রন্থি বা (Mixed Gland)- এরা শ্লেষ্মা ও পাতলা জলীয় পদার্থ উভয়ই নিঃসরণ করে।

৩.৪.২ যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা-

- **ফাইব্রাস যোজক টিস্যু (Fibrous Connective Tissue):** এই ধরনের যোজক টিস্যু ত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।
- **স্কেলিটাল যোজক টিস্যু (Skeletal Connective Tissue)**: দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এরকম দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিগুলোর

সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুধরনের হয়। যেমন: কোমলাস্থি এবং অস্থি।

- **তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue):** তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহণ করা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা। তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, রক্ত এবং লসিকা।
- **কোমলাস্থি (Cartilage)-** কোমলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।

৩.৪.২.১ অস্থি (Bone): অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় টিস্যু যার মাতৃকায় ক্যালসিয়াম-জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে দেহের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় যোজক কলায় পরিণত হয়। এর ম্যাট্রিক্সে পানি (২৫%), জৈব পদার্থ (৩০%) ও অজৈব পদার্থ (৪৫%) দ্বারা গঠিত হওয়ায় সম্পূর্ণ কলাটি কঠিন। জৈব অংশটি কোলাজেন (Collagen) ও অস্টিওমিউকয়েড (Osteomucoid) নিয়ে গঠিত হয়। অজৈব অংশটি প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট নিয়ে গঠিত। ম্যাট্রিক্সে অস্থিকোষ (Osteocyte) ছড়ানো থাকে। পেরিঅস্টিয়াম (Periosteum) নামক তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখা। অস্থির গঠন ও অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলো স্তরে সাজানো থাকে। স্তরগুলোকে ল্যামেলী (Lamellae) বলে। ল্যামেলীগুলো একটি সুস্পষ্ট নালীর চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রিয় এই নালীকে হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal) বলে। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান নালী ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলীগুলোর সমন্বয়ে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ল্যামেলায় ল্যাকুনা নামে কতগুলো ক্ষুদ্র গহবর থাকে। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম নালিকা বেরোয়। এদের ক্যানালিকুলি (Canaliculi) বলা হয়। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

অস্থি মজ্জা (Bone Marrow)- অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহবর থাকে তার নাম মজ্জা গহবর (Medullary cavity)।লম্বা অস্থির মজ্জা গহ্বরে এবং স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে যে নরম, জেলি সদৃশ, উচ্চ রক্তবাহী নালী সমৃদ্ধ বস্তু থাকে তাকে অস্থি মজ্জা (Bone marrow) বলে। অস্থি মজ্জা দেহের বৃহত্তম অঙ্গাগুলোর মধ্যে একটি এবং এর প্রধান কাজগুলো রক্ত উৎপন্ন করা। অস্থি মজ্জা দুই ধরনের: ১) লাল অস্থি মজ্জা (Red bone marrow) ও ২) হলুদ অস্থি মজ্জা (Yellow bone marrow)

অস্থির প্রকারভেদ

ক) ঘনত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১। **ঘন সন্নিবিষ্ট বা দৃঢ় অস্থি (Compact bone):** লম্বা অস্থি যেমন ফিমার ও হিউমেরাস এর অস্থিকাণ্ডের (Diaphysis) অংশে এ দৃঢ় অস্থি পাওয়া যায়।

২। **স্পঞ্জ বা জালিকা সদৃশ অস্থি (Spongy bone):** মাথার খুলি ও চ্যাপ্টা অস্থিগুলোতে এ ধরনের অস্থি পাওয়া যায়।

খ) আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে অস্থিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১। **লম্বা অস্থি (Long Bone)**- যেমন হিউমেরাস (Humerus), রেডিয়াস (Redius), আলনা (Ulna), ফিমার (Femer), টিবিয়া (Tibia) এবং ফিবুলা (Fibula)।

২। **খাটো অস্থি (Short bone)**- হাত ও পায়ের ছোট অস্থি- কারপাল (Carpal) এবং টারসাল (Tarsal)

৩। **চ্যাপ্টা অস্থি (Flat bone)**- স্ক্যাপুলা (Scapula), স্টারনাম (Sternum), পাজরের অস্থি বা (Rib)।

৪। **অসম আকৃতির অস্থি (Irregular bone)** - কশেরুকা (Vertebra)।

৫। **বায়ু প্রকোষ্ঠ অস্থি (Pneumatic bone)**- ম্যাক্সিলা (Maxilla), স্ফেনয়েড (Sphenoid) ও ইথময়েড (Ethmoid)।

৬। **পেশি থেকে উদ্ভুত ছোট অস্থি (Sesamoid bone)** - প্যাটেলা (Patella) ও পিজিফর্ম (Pisiform)

৩.৫ কঙ্কাল / অস্থি তন্ত্র (Skeletal system)

অস্থি তন্ত্র (Skeletal system)-বিশেষ ধরনের যোজক কলা নির্মিত অস্থি (Bone) ও তরুণাস্থি (Cartilage) -এর সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো নির্মাণ, অঙ্গ রক্ষণ এবং ভার বহন করে তাকে অস্থি তন্ত্র বলে।

অস্থি তন্ত্রের কাজ-

১। **দৈহিক কাঠামো গঠন** ও আকৃতি প্রদান

২। **চলাচল**- সংযুক্ত পেশির সংকোচনের মাধ্যমে চলন ঘটায়।

৩। **রক্ষণাবেক্ষণ**-মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি নরম ও সংবেদনশীল অঙ্গাসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

৪। **সঞ্চয়**- অস্থি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সঞ্চয় করে।

৫। **লোহিত কণিকা উৎপাদন**- অস্থি মজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়।

অস্থি তন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

মানবদেহের মোট ২০৬টি অস্থি আছে যা প্রধান ২ টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১) অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র (Axial skeletal system),

২) উপাঙ্গীয় অস্থিতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র- যে অস্থিসমূহ দেহের অক্ষরেখা বরাবর অবস্থান করে মস্তিষ্কের এবং দেহ গহ্বরের নরম অঙ্গাগুলোকে ধারণ করে ও রক্ষা করে, তাদের অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র বলে। এই তন্ত্রে যেসব অস্থি আছে সেগুলো হল-

১) মাথার খুলি বা করোটির অস্থি (Skull bones)

২) গলার অস্থি (Hyoid bone)

৩) মেরুদণ্ডের অস্থি (Vertebral column)

৪) বুকের অস্থি ও পাঁজরের অস্থিসমূহ (Sternum and rib)



চিত্র ৩.৫- মানব কঙ্কাল

মানবদেহের অস্থিসমূহের তালিকা

প্রধান ভাগ	অস্থির সংখ্যা	অন্তর্ভুক্ত অংশ	অস্থির সংখ্যা	বিন্যাস ও সংখ্যা		মোট অস্থির সংখ্যা
অক্ষিয় অস্থি	৮০টি	করোটি	২৮টি	করোটিকা	ফ্রন্টাল------------ ১টি প্যারাইটাল-------- ২টি টেম্পোরাল------- ২টি অক্সিপেটাল------- ২টি স্ফেনয়েড--------- ১টি এথময়েড---------- ১টি	৮টি
				মুখমন্ডলীয় অস্থি	ম্যাক্সিলা ------------- ২টি ম্যান্ডিবল----------- ১টি জাইগোম্যাটিক--------২টি ন্যাসাল-------------- ২টি ল্যাক্রিমাল ---------- ২টি ইনফিরিয়র ন্যাসাল--- ২টি ভোমার--------------- ১টি প্যালেটাইন --------- ২টি	১৪টি
				কানের অস্থি	ম্যালিয়াস----------২টি ইনকাস------------২টি স্টেপিস-----------২টি	৬টি
		হাইওয়েড	১টি		হাইওয়েড অস্থি---১টি	১টি
		দেহকান্ড	৫১টি	মেরুদন্ড	সারভাইক্যাল-------৭টি থোরাসিক-------- ১২টি লাম্বার ------------- ৫টি স্যাক্রাল----------- ৫টি কক্সিজিয়াল-------- ৪টি	৩৩টি
				বক্ষ পিঞ্জর	ষ্টার্ণাম-------------------১টি পর্শুকা-----------------২৪টি	২৫টি
উপাঙ্গীয় অস্থি	১২৬টি	উর্ধশাখা	৬৪টি	গ্রীবা ও পিঠ	ক্লাভিকল---------------২টি স্ক্যাপুলা-----------------২টি	৪টি
				বাহু	হিউমেরাস -----------২টি রেডিয়াস--------------২টি আলনা---------------২টি	৬টি

				হাত	কারপাল--------------১৬টি মেটা কারপাল--------১০টি ফ্যালেঞ্জেস---------- ২৮টি	৫৪টি
		নিম্নাঙ্গ	৬২টি	শ্রোণি	নিতম্ব অস্থি ------------ ২টি (ইলিয়াম,ইস্কিয়াম,পিউবিস)	২টি
				উরু ও জঙ্ঘা	ফিমার------------------২টি টিবিয়া------------------২টি ফিবুলা----------------২টি প্যাটেলা---------------২টি	৮টি
				পদতল	টার্সাল-----------------২টি মেটা টার্সাল -----------২টি ফ্যালেঞ্জেস------- ---২৮টি	৫২টি

৩.৫.১ করোটি (Skul)

২৮টি অস্থি নিয়ে করোটি গঠিত। এগুলো দুভাগে বিভক্ত- করোটিকা (Cranium) বা (Cranial bone) ও মুখমণ্ডলীয় অস্থি (Facial bone)।

ক) **করোটিকা (Cranium)**- করোটিকা ৮টি চ্যাপ্টা ও শক্ত অস্থি নিয়ে গঠিত। অস্থিগুলো খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত হওয়ায় একত্রে ঘন সন্নিবেশিত ও দৃঢ়সংলগ্ন থাকে।

১) **সম্মুখস্থ অস্থি (Frontal bone)**

২) **প্যারাইটাল অস্থি (Parietal bone)**

৩) **টেমপোরাল অস্থি (Temporal bone)** এ অস্থিতে শ্রবণাঙ্গ, শ্রমতি নালী, ক্যারোটিড নালী ও মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুর নালী অবস্থান করে।

৪) **অক্সিপিটাল অস্থি (Occipital bone)**

৫) **স্ফেনয়েড অস্থি (Sphenoid bone)**- এর দুই পাশে টেমপওরাল অস্থি, সামনে এথময়েড ও পিছে অক্সিপিটাল অস্থি থাকে।

৬) **এথময়েড অস্থি (Ethmoid bone)**

করোটিকার কাজ

- মস্তিষ্ককে আবৃত রাখা
- মস্তিষ্ককে ধারণ করে এবং
- আঘাত হতে রক্ষা করে।

খ) মুখমণ্ডলীয় অস্থি (Facial bone)

করোটিকার সামনের ও নিচের দিকের অংশ মুখমন্ডল অস্থি নিয়ে গঠিত। (প্রত্যেক কানে ৩টি করে মোট ৬ টি অস্থি, জিহবার পেছন দিকে গোড়ায় হাইওয়েড নামে অস্থি থাকে। এসব অস্থি অস্থিগণনার বাইরে থাকে)।

১) **উর্ধ্ব চোয়াল বা (Maxilla)**

২) **) নিম্ন চোয়াল বা (Mandible)** - ম্যান্ডিলই করোটির একমাত্র নড়নক্ষম অস্থি।

৩) **জাইগোম্যাটিক অস্থি (Zygomatic bone)**
৪) **নসিকা অস্থি (Nasal bone)**
৫) **ল্যাক্রিমাল অস্থি (Lacrimal bone)**
৬) **Inferior Nasal Concha**
৭) **ভোমার (Vomar)**
৮) **প্যালেটাইন অস্থি (Palatine Bone)**

হাইওয়েড অস্থি (Hyoid Bone) চোয়াল ও ল্যারিংক্সের মাঝখানে অবস্থিত। ঘাড়ের অনেক পেশি এ অস্থির সাথে লাগানো থাকে।

মুখমন্ডলীর অস্থির কাজ

- চোখ, কান, নাক ও মুখ এসব গহবরের আকৃতি দেয়,
- চোখ, কান, নাক ও মুখের অঙ্গ ধারণ ও রক্ষণ করে।

৩.৫.২ দেহকান্ড

দেহকান্ড দুটি অংশ নিয়ে গঠিত- ১) মেরুদন্ড ও ২) বক্ষপিঞ্জর।

৩.৫.২.১ মেরুদন্ড (Vertebral Column)- মেরুদন্ডকে শিরদাঁরা বা স্পাইনাল কলাম নামেও অভিহিত করা হয়। ৩৩টি কশেরুকা বা (Vertebra) নিয়ে মেরুদন্ড গঠিত। একটি আদর্শ কশেরুকা অনিয়মিত আকৃতির অস্থি যার গঠন বিভিন্ন কশেরুকায় বিভিন্ন রকম।

আদর্শ কশেরুকার বৈশিষ্ট-

১) দেহ (Body)- সামনের স্থুল অংশ যা স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত।
২) আর্চ (Arch)- পিছন দিকে পাতলা অস্থি নিয়ে গঠিত।
৩) ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন (Intervertebral Foramen)- এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve) ও রক্তবাহিকা অতিক্রান্ত হয়।
৪) কশেরুকীয় ছিদ্র (Vertebral Foramen)- সকল কশেরুকীয় ছিদ্র সম্মিলিতভাবে ভার্টিব্রাল ক্যানেল (Vertebral Canal) নির্মাণ করে। এর ভেতরে আবরণীসহ সুষুম্না কান্ড (Spinal Cord) ও রক্তবাহিকা সুরক্ষিত থাকে।



চিত্র ৩.৬- কশেরুকা

কশেরুকার প্রকারভেদ-

অবস্থান অনুযায়ী ৫ অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

১। সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা (Cervical vertebrae) --- --- --- --- --- ৭টি
২। থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা (Thoracic vertebrae) . --- --- --- --- --- ১২টি
৩। লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা (Lumbar vertebrae) --- --- --- --- --- --- --- ৫টি
৪। স্যাক্রাল (শ্রোনিদেশীয়) কশেরুকা (Sacral vertebrae) --- --- --- --- --- --- ---৫টি (একীভূত)
৫। কক্সিজিয়াল (পুচ্ছদেশীয়) কশেরুকা (Coccygeal vertebrae) --- --- --- --- ---৪টি (একীভূত)।

পরিণত বয়সে শ্রোণিদেশীয় কশেরুকা একীভূত হয়ে স্যাক্রাম (Sacrum) এবং পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা কক্সিস (Coccyx) গঠন করে, ফলে পৃথক অস্থি আকারে কশেরুকার সংখ্যা ২৬টিতে দাঁড়ায়।

১। **গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা**- সংখ্যা ৭টি

এর মধ্যে তিনটি ভিন্ন গড়নের কশেরুকা-

১। এ্যাটলাস (Atlas/ ১ম কশেরুকা),

২। এ্যাক্সিস (Axis/ ২য় কশেরুকা) ও

৩। (Vertebra Prominans/ ৭ম কশেরুকা)

৩.৫.২.২ বক্ষপিঞ্জর দেহের পর্শুকা, বক্ষদেশীয় কশেরুকা ও স্টার্নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে খাঁচার আকৃতি বক্ষপিঞ্জর তৈরি করে। বক্ষপিঞ্জরের গঠন-

- একটি স্টার্নাম (Sternum),
- ১২ জোড়া পর্শুকা (Ribs) ও
- ১২টি কশেরুকা নিয়ে গঠিত হয়।

স্টার্ণাম বৈশিষ্ট্য-

১। বুকের কেন্দ্রীয় সম্মুখ অংশে অবস্থিত চাপা অস্থি

২। ৩টি অংশে বিভক্ত –

ক) উপরের ত্রিকোণাকার ম্যানুব্রিয়াম,

খ) মাঝের লম্বা দেহ, এবং

গ) নিচের ক্ষুদ্র জিফয়েড প্রসেস।

৩। পার্শ্ব কিনারায় ক্ল্যাভিলের এবং ৭ জোড়া পর্শুকার খাঁজ থাকে।

পর্শুকা বৈশিষ্ট্য-

১। লম্বা, সুরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি।

২। দেহে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে।

৩। একটি আদর্শ পর্শুকার বৈশিষ্ট্য

ক) পশ্চাৎপ্রান্তে ফ্যাসেটবাহী মস্তক বা ক্যাপিচুলাম, ক্রেস্টবাহী গ্রীবা, সংযোগী তলসহ টিউবার্কল থাকে

খ) দেহ কোণ করে বাঁকানো থাকে।

গ) পর্শুকার সম্মুখ প্রান্ত তরুণাস্থিময়।

ঘ) প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা তরুণাস্থি দিয়ে স্টার্ণামের সাথে যুক্ত থাকে, এদের প্রকৃত পর্শুকা বলে।

৪। বাকি ৫ জোড়া (৮ম-১২তম) স্টার্নামের সাথে যুক্ত নয় বলে নকল পর্শুকা বলে।

৫। ৮ম, ৯ম ও ১০ম পর্শুকা তরুণাস্থির সাথে একীভূত হয়ে কোস্টাল আর্চ (Costal arch) তৈরি করে।

৬। ১১ ও ১২তম পর্শুকা সামনে অংশ উন্মুক্ত থাকে, তাই এদের 'ভাসমান পর্শুকা' বলে।

৭। পর্শুকার অন্তর্তলের নিচের কিনারায় কোস্টাল খাদে স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অবস্থান করে।

৮। প্রথম পর্শুকার উপরতলে সংস্পর্শে সাবক্লাভিয়ান ধমনী ও শিরা থাকে।

৯। উপরে ও নিচে দুই কোস্টাল তরুণাস্থির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে ইন্টারকোস্টাল স্পেস বলে।

বক্ষ পিঞ্জরের কাজ- হৃদপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ বক্ষপিঞ্জরের ভেতরে সুরক্ষিত থাকে।

২। উপাঙ্গীয় কঙ্কাল: উর্ধাঙ্গ (দুই বাহু ও বক্ষ-অস্থিচক্র) ও নিম্নাঙ্গ (দুই পা ও শ্রোণি-অস্থিচক্র) এর অস্থিগুলোকে একত্রে উপাঙ্গীয় কঙ্কাল বলে।

২০২৩

উর্ধাঙ্গের অস্থিসমূহ: বক্ষ-অস্থিচক্র ও দুইবাহু নিয়ে উর্ধাঙ্গর গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩২ টি করে মোট ৬৪ টি অস্থি উর্ধাঙ্গের অন্তর্গত।

বক্ষ অস্থি ও হাতের অস্থি

১) পিঠের ত্রিকোণাস্থি (Scapula)

২) কণ্ঠার অস্থি (Clavicle)

৩) উর্ধ্ব বাহুর অস্থি (Homarus)

৪) সম্মুখ বাহুর অস্থি (Radius & Ulna)

৫) কারপাল অস্থি (Carpal Bones)

৬) মেটা কারপাল অস্থি (Meta carpal Bones) এবং

৭) হাতের আঙুলের অস্থি (Phalanges)।

নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ: শ্রোণি-অস্থিচক্র ও দুইপা নিয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি নিম্নাঙ্গে রয়েছে।

শ্রোণি অস্থি ও পায়ের অস্থি -

১) বস্তিদেশের হাড় (Pelvis)

২) উরুর অস্থি (Femur)

৩) নিম্ন পায়ের অস্থি (Tibia & fibula)

৪) গোড়ালি সংলগ্ন অস্থি (Tarsal bones)

৫) চরণ অস্থি (Metatarsal bones) এবং

৬) পায়ের আঙ্গুলের অস্থি (Phalanges)।

২) **নিম্ন পায়ের অস্থি-** নিম্ন পা এ দুটি অস্থি থাকে- টিবিয়া ও ফিবুলা।

টিবিয়া- বেশি মোটা এর উর্ধ প্রান্ত দুটি কন্ডাইল থাকে। টিবিয়ার দেহ ত্রিধারবিশিষ্ট। এর সম্মুখ কিনারা কুঁটি (Shin) নামে পরিচিত। টিবিয়ার নিম্ন প্রান্তে ম্যালিওলাস নামে দুটি উঁচু অংশ থাকে। এতে ট্যালাসের (টার্সাল অস্থি) সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংযোগী তলও রয়েছে।

ফিবুলা- দেখতে দীর্ঘ যষ্টির মতো। এর মস্তক চোখা ধরনের ও নিচের দিকে থাকে।

৩) **চরণ**- গোড়ালি পদতল ও আঙ্গুল নিয়ে চরণ গঠিত।

- গোড়ালি ও পদতলের পৃষ্ঠভাগ গঠিত হয় ৭টি বিভিন্ন আকৃতির টার্সাল অস্থি দিয়ে-
    - ১টি করে ক্যালকেনিয়াস, ট্যালাস, কিউবয়েড, নেভিকুলার ও
    - ৩টি কিউনিফর্ম।
- মেটাটার্সালের সংখ্যা ৫। এগুলো নলাকার ও সামান্য লম্বা এবং পদতল গঠন করে।
- পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলো ফ্যালাঞ্জেসে গঠিত। পা এর অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে সন্ধির মাধ্যমে যুক্ত। নিতম্ব সন্ধি, হাটুর সন্ধি ও গোড়ালি সন্ধি সবচেয়ে বড়।

পায়ের কাজ: ভারবহন করে ও চলাচলের সাহায্য করে।

অস্থিসন্ধি (Joints): যে স্থানে দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগ হয়, তাদের মধ্যে নড়াচড়া হলে অথবা না হলেও তাকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে যোজক কলা দিয়ে এমনভাবে যুক্ত থাকে যাতে সংলগ্ন অস্থিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারেই অনড়- করোটির অস্থিসন্ধি। কোনোটি আবার সামান্য সঞ্চালনক্ষম- আন্তঃকশেরুকীয় অস্থিসন্ধি। কিছু সন্ধির ফলে অস্থিগুলো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দে সঞ্চালনক্ষম হয়ে থাকে।

অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস: অস্থিসন্ধি ৩ রকমের হয়ে থাকে-
ক) তন্তুময় সন্ধি, খ) তরুণাস্থিময় সন্ধি এবং গ) সাইনোভিয়াল সন্ধি।

গ) **সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Synovial joints)** বৈশিষ্ট্য-



- সাইনোভিয়াল গহবর থাকে।
- দুই অস্থির সংযোগী তল মসৃণ স্বচ্ছ তরুণাস্থির (Hyaline cartilage) পাতলা স্তরে আর্বত থাকে
- গহ্বর বেষ্টনকারী সাইনোভিয়াল আবরণী (Synovial membrane) নিঃসৃত মিউকোপলিস্যাকারাইডে গঠিত সাইনোভিয়াম নামে পিচ্ছিল তরলের প্রলেপ থাকে।
- সন্ধি গহবরটি আর্টিকুলার ক্যাপসুল নামে একটি দ্বিস্তরী আবরণিতে বেষ্টিত।

সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির শ্রেণিবিন্যাস

সংযোগকারী তলের সংখ্যার ভিত্তিতে দুই ভাগ করা হয়- ১) সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি ও ২) জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি। সংযোগকারী তলের আকারের উপর ভিত্তি করে সানোভিয়াল অস্থিসন্ধিকে ৬ প্রকারে বিভক্ত করা যায়: ১) সমতল অস্থিসন্ধি, ২) হিঞ্জ অস্থিসন্ধি, ৩) পিভট অস্থিসন্ধি, ৪) কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি, ৫) স্যাল অস্থিসন্ধি এবং ৬) বল ও কোটর অস্থিসন্ধি।

১) **সমতল অস্থিসন্ধি (Plane joints)**- এক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিতে দুটি অস্থির সংযোগী তল চাপা বা সামান্য বাঁকানো এবং অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় যে কোনো দিকে সঞ্চালিত হয়। উদাহরণ- দুটি কার্পাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intercarpal joints); দুটি মেটাটাসাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intermetatarsal joints)।

২) **কব্জা অস্থিসন্ধি (Hinge joints)**- এক্ষেত্রে একটি অস্থির উত্তল মস্তক অন্য অস্থির অবতল অংশে এমন চমৎকার ভাবে বসানো থাকে যার ফলে অস্থির চলন শুধু দরজার কপাটের মতো হয়। উদাহরণ- কনুইয়ের সন্ধি (Elbow joints); হাঁটুর সন্ধি (Knee joints)।

৩) **পিভট অস্থিসন্ধি (Pivot joints)**- এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির গোল সুচালো বা কোণাকার সংযোগী তল এমন একটি রিং-এর ভেতর ঢোকানো থাকে যা অন্য একটি অস্থি ও লিগামেন্টের অংশ নিয়ে গঠিত এবং প্রবিষ্ট অস্থিটি কেবল ঘূর্ণনে সক্ষম হয়। উদাহরণ- প্রথম দুইটি গ্রীবা দেশীয় বা সারভাইকাল কশেরুকার মধ্যকার অস্থিসন্ধি (Atlanto-axial joint)।

৪) **কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি (Condyloid joints)**- এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির ডিম্বাকার মস্তক অন্য অস্থির ডিম্বাকার গহবরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো তলে সঞ্চালনক্ষম হলেও ঘূর্ণনে অক্ষম থাকে। উদাহরণ- হাঁটুর সন্ধি (Knee joint)।

৫) **স্যাডল অস্থিসন্ধি**- এক্ষেত্রে এক অস্থির সংযোগী তলের একদিক উত্তল অন্যদিক অবতল এবং দ্বিতীয় অস্থির বৈশিষ্ট ঠিক তার বিপরীত। এই সন্ধিতে অস্থির বিভিন্নমুখী সঞ্চালন সম্ভব হলেও ঘূর্ণন অত্যন্ত সীমিত। উদাহরণ- বৃদ্ধাঙ্গুলের কার্পাল ও মেটাকাপালের মধ্যকার সন্ধি (Carpometacarpal joint of the thumb)।

৬) **বল ও কোটর অস্থিসন্ধি (Ball and socket joint)**- এক্ষেত্রে একটি অস্থির বলের মতো গোল মস্তক অন্য অস্থির পেয়ালাকৃতির গহবরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো অক্ষে বা তলে তাদের সঞ্চালন ঘটে। উদাহরণ- স্কন্ধসন্ধি (Shoulder joint), জঙ্ঘাসন্ধি (Hip joint)।

একটি আদর্শ অস্থি সন্ধির গঠন-

১। **অস্থিসন্ধির বহির্ভাগ**- অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তরুণাস্থিতে (Hyaline cartilage) মোড়ানো থাকে।

২। **অস্থিসন্ধি আবরণী**- এ আবরণী অস্থিসন্ধির বহির্ভাগে থাকে ও সেখান থেকে অস্থি আবরণীতে মিলে যায়।
৩। **অস্থিসন্ধি গহবর**- এ গহবর সংকীর্ণ ফাঁকের মত যা সন্ধির তরুনাস্থির বহির্ভাগ ও অস্থিসন্ধি আবরণী দিয়ে চারদিকে আবদ্ধ থাকে। এতে সাইনোভিয়াল রস নিঃসৃত হয়।

মানুষের চলনে পেশি ও অস্থিতন্ত্রের সমন্বয় মানুষের চলনে পেশি ও পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির মাধ্যমে হয়। চলনের জন্য পেশি ও অস্থির সমন্বয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে পেশি-অস্থিতন্ত্র (Musculo-skeletal system)।

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা

বিভিন্ন পেশির ভূমিকা-

১) **এক্সটেনসর (Extensor)**- এ ধরনের পেশি অঙ্গাকে প্রসারিত করে বা ছড়িয়ে দেয়– ট্রাইসেপস্ (Triceps) যা সম্মুখ বাহুকে প্রসারিত করে।

২) **ফ্লেক্সর (Flexor)**- এ ধরনের পেশি অঙ্গাকে দুই ভাঁজ করে- বাইসেপস্ (Biceps) যা কনুইকে বাঁকায়।

৩) **এবডাক্টর (Abductor)**- এ পেশি দেহের অক্ষ থেকে দেহের অঙ্গাকে দুরে সরিয়ে নেয়- ডেলটয়েড পেশি (Deltoid muscle)।

৪) **এডাক্টর (Adductor)**- এ পেশি কোনো অঙ্গাকে দেহ অক্ষের কাছে টেনে আনে- ল্যাটিসিমাস ডরসি (Latissimus dorsi)।

৫) **ডিপ্রেসর (Depressor)**- এ পেশি কোনো অঙ্গাকে নিচে নামায় - ডিপ্রেসর ম্যানডিবুলা (Depressor mandibula) নামে পেশি নিচের চোয়াল নামিয়ে মুখগহবরকে উন্মুক্ত করে।

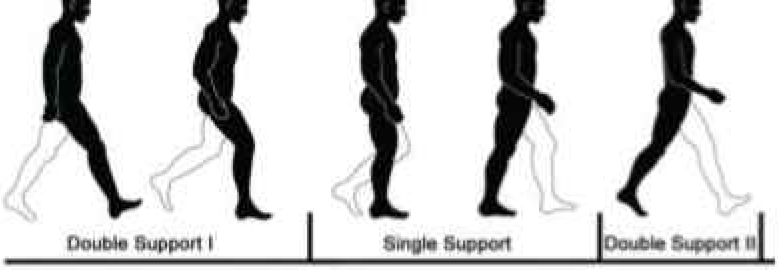
৬) **লিভেটর (Levator)**- কোনো অঙ্গাকে নিচ থেকে উপরে তোলে - ম্যাসেটার (Masseter) নিচের চোয়াল উপরে তুলে মুখ বন্ধ করে।

৭) **রোটেটর (Rotator)**- এ পেশি অঙ্গাকে প্রধান অক্ষের চারপাশে বা ডানে বাঁয়ে ঘোরায় - পিরিফর্মিস (Pyriformis) ফিমারকে উপরে তোলে বা ঘোরায়।

৮) **প্রোট্রাক্টর (Protractor)**- এ পেশি সংশ্লিষ্ট অস্থিকে উপর দিকে টেনে অঙ্গাকে সামনে প্রসারিত করে।

৯) **রিট্র্যাকটর (Retractor)**- এ পেশি সংশ্লিষ্ট অস্থিকে নিচের দিকে টেনে অঙ্গাকে পেছনের দিকে প্রসারিত হয়।

মানুষের চলনে পেশি-অস্থিতন্ত্রের ভূমিকা: চলনের সময় মানুষ তার দেহের ভার পর্যায়ক্রমে ডান ও বাঁ পায়ের উপর ভর করে। কারণ যে সময় কোনো এক পা মাটির উপর উঠে থাকে তখন মাটিতে লাগানো পা বা মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে ওজন স্থানান্তরের অভিকর্ষ রেখা বাহিত হয়।



চিত্র ৩.৭: সঞ্চারণ ও চলন

রক্তঃ

তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue): রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত এবং ললিবর্ণের তরল যোজক টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়।

রক্তের বৈশিষ্ট-

ক) রক্তের পরিমাপ ৭০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্কের : ৫-৬ লিটার।

খ) স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া : সামান্য ক্ষারীয়, pH =৭.৩৬ -৭.৪৫

গ) আপেক্ষিক গুরুত্ব : ১.০৫২ হতে ১.০৬০ এর মধ্যে।

ঘ) রক্তের তাপমাত্রা : ৩৬± হতে ৩৮± সেলসিয়াস।

ঙ) স্বাদ : লবণাক্ত।

চ) বর্ণ : লাল; লোহিত কণিকায় লৌহ উপাদান হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল হয়।

রক্তের কাজ

- অক্সিজেন পরিবহণ: লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের ও প্লাজমার মাধ্যমে রক্ত ফুসফুস থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা কলাতে অক্সিজেন বহন করে ।
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড: অন্তঃশ্বসনের ফলে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড কলা থেকে ফুসফুসে পরিবহণ করে।
- খাদ্যসার : পরিপাককৃত খাদ্যর অন্ত্র থেকে কলা ও কোষে পরিবহণ করে।
- সঞ্চিত খাদ্য পরিবহণ: দেহের বিভিন্ন সঞ্চয় ভান্ডার (যেমন-যকৃত) থেকে খাদ্যসার কলাকোষে বহন।
- হরমোন পরিবহণ: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন দেহের প্রয়োজণীয় কোষে পরিবহণ করে।
- দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ: অধিকতর সক্রিয় কলায় উৎপন্ন তাপ দেহের সর্বত্র রক্তের সাহায্যে বন্টনের ফলে শরীরের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- জীবানু প্রতিরোধ: শ্বেত কণিকাগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবানু গ্রাস করে ধংস করে।
- ক্ষত নিরাময়: ফাইব্রোব্লাষ্ট উৎপন্ন করে কলার ক্ষত নিরাময় করে।
- রক্তপাত প্রতিরোধ: তঁচন (Clotting) প্রক্রিয়ায় ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করে।

রক্তের উপাদান:

১) রক্ত কণিকা (Blood Corpuscles) -৪৫%

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের কোষকে রক্তকণিকা বলে।

প্রধানত তিন প্রকার: ক) লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte), খ) শ্বেত রক্তকণিকা (Leucocyte) ও গ) অনুচক্রিকা (Platelet)।



চিত্র ৩.৮: রক্তের কণিকা সমূহ

লোহিত রক্ত কণিকা (Erythrocyte): মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা ক্ষুদ্র দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো লাল রংয়ের কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। এর কিনারা মসৃন এবং মধ্যাংশের চেয়ে পুরু। পরিণত কনিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক।

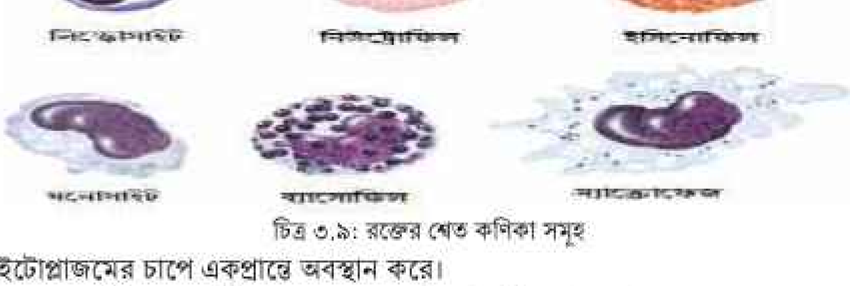
- পরিমাণ: সুস্থ দেহের রক্তে ১৫ গ্রাম/১০০মিলি হিমোগ্লোবিন থাকে।
- আয়তন: গড় ব্যাস ৭.৩— এবং গড় স্থুলতা ২.২—
- সংখ্যা: বিভিন্ন বয়সের মানবদেহের প্রতিঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তণিকার সংখ্যা নিম্নরূপ
    - ভ্রূণ: ৮০-৯০ লক্ষ
    - শিশু: ৬০-৭০ লক্ষ;
    - পূর্ণবয়স্ক পুরুষ: ৫০ লক্ষ; পুর্ণবয়স্ক স্ত্রী: ৪৫ লক্ষ।
- বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন- ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়ে।
- উৎপত্তি স্থল: ভ্রূণীয় জীবনে যকৃত, প্লীহা ও থাইমাস থেকে সৃষ্টি হয়। জন্মের পর ২০ বছর পর্যন্ত দেহের প্রায় সব লম্বা অস্থির অস্থিমজ্জার Haemocytoblast নামক কোষ থেকে এবং জীবনের বাকি সময় যা হিউমেরাস, ফিমার, স্টার্নাম, কশেরুকা,পর্শুকা প্রভৃতি অস্থির লাল অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়।
- আয়ু: গড় আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)।
- লোহিত রক্ত কণিকার কাজ

> ভেতরের হিমোগ্লোবিন শরীরের সবখানে অক্সিজেন (O) বহন করে।

> নিষ্কাশনের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO) কে কলা (Tissue) থেকে ফুসফুসে বহন করে।

> হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে কাজ করে রক্তের সাধারণ ক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শ্বেত রক্ত কণিকা (Leucocyte): মানবদেহের পরিণত শ্বেতকণিকা অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াস যুক্ত বড় কোষ। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবানু ধ্বংস করে। আকার: নির্দিষ্ট আকারবিহীন, প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কাকার ও অশ্বখুরাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াস



চিত্র ৩.৯: রক্তের শ্বেত কণিকা সমূহ

- সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রান্তে অবস্থান করে।
- আয়তন: লোহিত রক্ত কণিকার চেয়ে বড়। গড় ব্যাস ভিন্নতা অনুসারে ৭.৫-২০—

- সংখ্যা: প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বাড়তি থাকে।
- গঠন: শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিওপ্রোটিন সমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, এসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগত ভাবে শ্বেত রক্ত কণিকাকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা - ক) দানাহীন (Agranulocytes) এবং খ) দানাময় (Granulocytes)।

ক) এগ্র্যানুলোসাইট: দানাহীন, স্বচ্ছ ও বৃহদাকার নিউক্লিয়াসযুক্ত। আকৃতিগত ভাবে এরা দুই ধরনের, যথা- লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) ও মনোসাইট (Monocyte)। এদের

- উৎপত্তি স্থল: লসিকা গ্রন্থি, প্লীহা, থাইমাস ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা কলা থেকে।

লিম্ফোসাইট: সমসত্ব ও ক্ষারাসক্ত সাইটোপ্লাজোমের পাতলা স্তরে আবৃত বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। এরা কৈশিক নালী থেকে যোজক কলায় অভিযাত্রী হতে পারে।

মনোসাইট: বিপুল পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবাহী বড় কণিকা।

লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট রক্ত কণিকার কাজ:

> লিম্ফোসাইট এন্টিবডি উৎপন্ন করে।

> লিম্ফোসাইট থেকে ফাইব্রোব্লাস্ট সৃষ্টি হয়ে কলার ক্ষয়পুরণ করে।

> মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধংস করে।

খ) গ্রানুলোসাইট: সূক্ষ দানাময় এবং ২-৭ খন্ডযুক্ত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। দানাগুলো লিশম্যান রঞ্জকে নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারার ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রানুলোসাইট ৩ ধরনের, যথা :

নিউট্রোফিল (Neutrophil): নিউট্রোফিল এর সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত।

ইসিনোফিল (Eosinophil) : ইওসিনোফিল এর দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণধারণ করে।

ব্যাসোফিল (Basophil): ব্যাসোফিল এর দানাগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারণ করে

নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও ব্যাসোফিল কণিকার কাজ

> নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইট্রোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ভক্ষণ করে।

> ইসিনোফিল ও ব্যাসোফিল হিস্টামিন নিঃসৃত করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

> ব্যাসোফিল নিসৃত হেপারিন রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

অনুচক্রিকা (Thrombocytes or Platelets):

অনুচক্রিকা ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা। এটি দানাময় ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

আকার: গোল, ডিম্বাকার বা দন্ডাকার কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন।

আয়তন: ৩ -৫ — ব্যাস বিশিষ্ট

সংখ্যা: পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে সংখ্যা প্রায় ২.৫-৫ লক্ষ।

গঠন: দানাময় সাইটোপ্লাজম, গহ্বর, পিনোসাইটিক গহ্বর ও অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু একক আবরণী বেষ্টিত।

উৎপত্তি স্থল:অস্থিমজ্জার অন্যতম বড় কোষ মেগাক্যারিওসাইট (Megakaryocyte) এর ভগ্ন ক্ষুদ্রাংশ থেকে উৎপত্তি হয়। অন্যদের মতে শ্বেত কণিকা থেকে থ্রম্বাসোইটের সৃষ্টি হয়।

আয়ু: গড় আয়ু প্রায় ৫-১০দিন ।

পরিণতি:আয়ু শেষে প্লীহা, যকৃৎ ও অন্যান্য অঙ্গে বিনষ্ট হয়।

অণুচক্রিকার কাজ

> রক্ত জমাট বাঁধতে অংশ নেয়।

> রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রস্থ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠনে অংশ নেয়।

> বিভিন্ন সংকোচনধর্মী পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তবাহিকার সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধে সাহায্য করে।

এরাইথ্রোসাইট, লিউকোসাইট এবং থ্রম্বোসাইট-এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	**এরাইথ্রোসাইট**	**লিউকোসাইট**	**থ্রম্বোসাইট**
সংখ্যা (/mm^3 of blood)	৫০ লক্ষ	৫-৮ হাজার	২.৫৫ লক্ষ
নিউক্লিয়াস	পরিপক্ক অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না	সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে	কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না
বর্ণ	লাল	বর্ণহীন	বর্ণহীন
আয়ু	১২০ দিন	নির্দিষ্ট নয়	৫-৯ দিন
আকৃতি	দ্বি -অবতল, চাকতির মত	গোলাকার বা অনিয়মিত	
কাজ	শ্বসন	রোগ প্রতিরোধ	রক্ত তঞ্চন

২) **রক্তরস (Plasma)** ৫৫%

রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশকে রক্তরস বলে। এতে রয়েছে

ক) পানির পরিমাণ ৯১ - ৯২%।

খ) দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮ - ৯%।

গ) জৈব পদার্থ ৭.১ - ৮.১%। যেমন- গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, লবন, ভিটামিন ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, বিলিরুবিন, কেরোটিন ইত্যাদি।

ঘ) অজৈব পদার্থ ০.৯%। যেমন- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি।

রক্ত রসের কাজ

> পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গে বাহিত হয়।

> কলা থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়।

> কলার অধিকাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্ত রসে বাইকার্বনেট রূপে দ্রবীভূত থাকে।

> অতি অল্প পরিমাণ অক্সিজেন এতে বাহিত হয়। লোহিত কণিকায় সংবদ্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়।

> হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে।

> রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

রক্ত জমাট বাঁধার পদ্ধতি

শরীরের ক্ষতস্থান থেকে তরল রক্ত বেরিয়ে ঘন জেলীর মতো থকথকে পিন্ডে পরিণত হলে, তাকে রক্তজমাট (Clot) বলে। রক্তরস থেকে রক্তজমাটের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে রক্তের জমাট বাঁধা বলে। রক্ত ঘাটতির - হাত থেকে রক্ষা পেতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া মানুষের এক গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ১৩টি ফ্যাক্টর (Factor) -এর সমন্বয়ে কয়েকটি ক্রমান্বয়িক ধাপে সংঘটিত হয়।

নিচে রক্ত বা জমাট বাঁধার প্রধান ধাপগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

১) আঘাতের ফলে ক্ষতস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিদীর্ণ কলা থেকে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন নামক এনজাইম বের হয়।

২) থ্রোম্বোপ্লাস্টিন ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রোম্বিনকে সক্রিয় থ্রোম্বিনে পরিণত করে।

৩) থ্রোম্বিন ফিব্রিনোজেনকে ফিব্রিন নামক জালকে রূপান্তরিত করে।

৪) ফিব্রিন জালকে লোহিত ও শ্বেত কণিকা জড়িয়ে যায় এবং কোষজাত উপাদানগুলো এবং রক্তের অন্যান্য অংশ আটকে থাকে; ফলে রক্ত জমাট বাঁধে।

লসিকা: মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে লসিকা বলে। এগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে, যাকে ১০৪

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) বলে। লসিকা ঈষৎ ক্ষারীয় স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ। এর মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে, এদের লসিকাকোষ (Lymphoid cell) বলে।

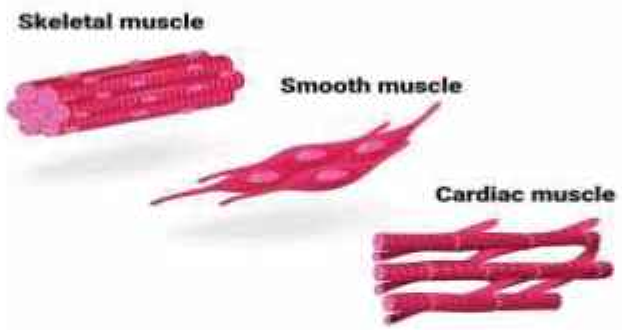
৩. পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন ও প্রসারণক্ষম বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে। এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশিকোষগুলো সরু, লম্বা এবং তন্তুময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরাকাটা থাকে, তাদের ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণ পেশি (Smooth muscle) বলে। পেশিকোষ সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ঘটায়। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের, ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি।

(i) ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি (striated muscle): এই পেশি প্রাণির ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশিটিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রের সংলগ্ন থাকায় একে কঙ্কালপেশিও বলে। উদাহরণ মানুষের হাত এবং পায়ের পেশি।

(ii) অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি (Smooth muscle): এই পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণির ইচ্ছাধীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না।এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে। প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন, খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন।

(iii) কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি (Cardiac muscle} এই পেশি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিন্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে এবং একযোগে সঙ্কুচিত হয়।



চিত্র ৩.১০: বিভিন্ন পেশী সমূহ

(iv) পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখে।

হৃদপিন্ড (Heart)

হৃদপিন্ড হল হৃদপেশী দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকার ভেতরে ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মত যন্ত্র যা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত করে। একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃদপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি নিলয় থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার রক্ত বের করে দেয়। একটি হৃদপিন্ডের ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম। মহিলাদের হৃদপিন্ড পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ ওজনে কম হয়। হৃদপিন্ডের অবস্থান ও হৃদপিন্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপর এবং দুই ফুসফুসের মাঝ বরাবর বামদিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থান করে। এর গোড়া (Base) চওড়া ও উপরের দিকে থাকে এবং সুঁচালো শীর্ষদেশ (Apex) নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাকে (5th inter costal space), বুকের বাঁ দিকে (Nipple) এর ১/২ ইঞ্চি নিচে ও পিছনে থাকে। এটি স্টারনাম (Sternum) ও রিগুলোর (Ribs) পেছনে অবস্থিত।

হৃদপিন্ডের গঠন: হৃদপিন্ডের লেয়ার (Layer) ৩টি। বাইরে পেরিকার্ডিয়াম। মাঝে মাইওকার্ডিয়াম (Myocardium) এবং ভিতরে এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)।

হৃদপিন্ড একটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা ঝিল্লিতে আবৃত। এর বাইরের স্তর প্যারাইটাল (Parietal) এবং ভিতরেরটি ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম (Visceral pericardium); দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থিত তরল পদার্থ হৃদপিন্ডের সংকোচন সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি দেখতে লালচে রংয়ের ও ত্রিকোণাকার। মানুষের হৃদপিন্ড সম্পূর্ণভাবে চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ (Right & left ventricle) এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম নিলয় থাকে। বাম অপেক্ষা ডান নিলয়ের প্রাচীর প্রায় তিন গুণ পুরু থাকে। অলিন্দ ও নিলয় উভয়ে লম্বালম্বিভাবে যে পর্দা (Septum) দিয়ে বিভক্ত থাকে তাদের যথাক্রমে –

ক) অলিন্দ পর্দা (Inter-atrial septum) এবং

খ) আন্তঃনিলয় পদ (Inter-ventricular septum) বলে।

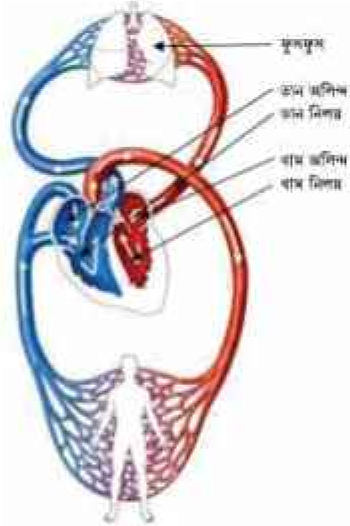
ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগকারী ছিদ্র ট্রাইকাস্পিড কপাটিকায় (Tricuspid valve) সংরক্ষিত থাকে। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথের কপাটিকা বাইকাস্পিড কপাটিকা (Bicuspid valve) নামে পরিচিত। এ উভয় ধরনের কপাটিকা নিলয় প্রাচীরের মাংসল অভিক্ষেপ রূপী প্যাপিলারী পেশি (Papilary muscle) করডি টেন্ডেনি (Cordae tendinae) নামক তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভূত পালমোনারী ধমনীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে সৃষ্ট অ্যাওটার মুখের কপাটিকা দুইটি অর্ধচন্দ্রাকার (Semilunar)। এরা রক্তকে পেছনদিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। অলিন্দে আগত শিরাগুলোর প্রবেশ পথ কপাটিকাবিহীন। এপিকার্ডিয়ামে প্রায়ই চর্বি লেগে থাকে। মায়োকার্ডিয়াম হৃদপিন্ডের সংকোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠগুলো এন্ডোকার্ডিয়ামে গঠিত। এ স্তর কপাটিগুলোকেও বেষ্টন করে রাখে এবং প্রধান রক্তবাহিকাগুলোর অন্তঃস্থ স্তরের সাথে অবিচ্ছিন্ন।

হৃদপিন্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন: হৃদপিন্ডের সংকোচন প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতরে গতিশীল থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার হৃদস্পন্দন ঘটে। হৃদপিন্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদস্পন্দন হয়ে থাকে। হৃদপিন্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) ও ডায়স্টোল (Diastole) বলে। হৃদপিন্ডের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে রক্ত সংবহিত হয় :

১। শরীরের উর্ধ্বভাগ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং নিম্ন ভাগ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধ্যমে হৃদপিন্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

২। ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত দুইটি পালমোনারী শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে পৌঁছায়।

৩। ডান অলিন্দ সংকোচনের সময় নিলয় প্রসারিত থাকে। তাই অলিন্দের মধ্যে চাপ বেশি থাকে এবং নিলয়ের মধ্যে চাপ কম থাকে। এ চাপ পার্থক্যের জন্য ডান অলিন্দ- নিলয় ছিদ্র পথে অবস্থিত ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা খুলে যায় এবং CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এ সময় ভেনাক্যাভা দুইটির কপাটিকা বন্ধ থাকে।



চিত্র ৩.১০: রক্তসংবহন

৪। ডান অলিন্দ সংকোচনের সময়ই বাম অলিন্দেরও সংকোচন ঘটে এবং একই ভাবে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে অবস্থিত বাইকাস্পিড কপাটিকা খুলে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এ সময় পালমোনারী শিরা দুটির কপাটিকা বন্ধ থাকে।

৫। অলিন্দ খালি হয়ে গেলে এর সংকোচন শেষ হয়ে। প্রসারণ শুরু হয় এবং সংগে সঙ্গে রক্তে পূর্ণ নিলয়ের সংকোচন ঘটে, ফলে নিলয়ের মধ্যে চাপ বাড়ে এবং বাইকাস্পিড ও ট্রাইকাস্পিড কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাওটা ও পালমোনারী ধমনীতে অবস্থিত সেমিলুনার (অর্ধচন্দ্রাকার) কপাটিকা খুলে যায়।

৬। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিশোধনের জন্য পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরিত হয়।

৭। বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওটায় প্রেরিত হয়।

৮. অ্যাওর্টা থেকে ধমনী, শাখা-ধমনী ও কৈশিক জালিকার মাধ্যমে রক্ত সারা দেহে সংবহিত হয়। এভাবে হৃদপিন্ডের ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে রক্তসংবহন অব্যাহত থাকে এবং প্রত্যেক স্পন্দনের সময় চক্রাকারে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

হৃদপিন্ডের মধ্যে দিয়ে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

হৃদচক্র বা কার্ডিয়াক সাইকেল (Cardiac cycle): হৃদপিন্ডের প্রতি স্পন্দনে হৃদপিন্ডের পরিবর্তনগুলোর যে চক্রাকার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে কার্ডিয়াক সাইকেল বা হৃদচক্র বলে। স্বাভাবিকভাবে হৃদস্পন্দনের হার যেহেতু মিনিটে ৭০-৮০ (গড়ে ৭৫) বার সেহেতু হৃদচক্রের স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড। প্রতি স্পন্দনে হৃদপিন্ড একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচনকে সিস্টোল এবং প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। হৃদচক্র চলাকালীন হৃদপিন্ডে রক্ত সংবহন ঘটনা প্রবাহ সমুহঃ

১। অলিন্দের ডায়াস্টোল (Atrial diastole)

ক) অলিন্দ দুইটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে।

খ) ট্রাইকাস্পিড এবং বাইকাস্পিড কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) অলিন্দ মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়; ফলে বাম নিলয় দেহে বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র এবং ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অলিন্দে এবং পালমোনারী শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এ সময় হৃদপিন্ডের পেশি থেকেও CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অলিন্দে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। অলিন্দ দুইটি রক্তপূর্ণ হলে অলিন্দের সিস্টোল হয়।

২) অলিন্দের সিস্টোল (Atrial systole)

ক) এ সময় অলিন্দ দুটি সংকুচিত হয়।

খ) ট্রাইকাসপিড ও বাইকাস্পিড কপাটিকা উন্মুক্ত থাকে এবং সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) অলিন্দ মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে ডান অলিন্দ থেকে CO_2, সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2, সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড।

৩) নিলয়ের সিস্টোল (Ventricular systole)

ক) নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়।

খ) ট্রাইকাস্পিড ও বাইকাস্পিড কপাটিকা বন্ধ এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে।

গ) নিলয় মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং নিলয় থেকে রক্ত নিলয়ের বাইরে নির্গত হয়। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালোনারী ধমনীতে এবং বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

৪) নিলয়ের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole)

ক) এ সময় নিলয় দুটি শিথিল অবস্থায় থাকে।

খ) বাইকাস্পিড ও ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা উন্মুক্ত হয় এবং সেমিনার কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) নিলয় মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায় ফলে অলিন্দ দুটি থেকে রক্ত নিয়ে প্রবেশ করে। ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম নিলয়ে O_2 রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড।

(d) স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা স্নায়ুকোষগুলো একত্রে স্নায়ু টিস্যু গঠন করে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি বার্তা আকারে বহন করে নিয়ে যায়। একটি আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে: কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং অ্যাক্সন। নিউরন কোষ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে, তবে সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয়, তাদের ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটি ডেনড্রাইটের মধ্যে যে স্নায়ুসন্ধি গঠিত হয়, তাকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। স্নায়ুটি উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্কে তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ুটি স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করাসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

অঙ্গ ও তন্ত্র

তন্ত্র (Organ System): কয়েকটি অঙ্গ একত্রিত হয়ে তৈরি হয় একটি **তন্ত্র**। মানবদেহকে প্রধানত ১১ টি তন্ত্রে বিভক্ত করা যায়। যেমন- কঙ্কালতন্ত্র, পেশি তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, হৃদপিন্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকাতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, অন্তঃক্ষরাতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও বহিরাবরণতন্ত্র।

- **কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal System):** এই তন্ত্র অস্থি, তরুণাস্থি, সন্ধি প্রভৃতি সমন্নয়ে গঠিত। কঙ্কালতন্ত্রের কাজ দৈহিক কাঠামো গঠন, চলাচল, রক্ষণাবেক্ষণ, সঞ্চয়, লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রভৃতি।
- **পেশিতন্ত্র (Muscular System):** এই তন্ত্র অস্থির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশি নিয়ে গঠিত। পেশি কলা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের কাজ করে।
- **শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System)** এই তন্ত্র শ্বাস যন্ত্র বা Pharynx, শ্বাসনালী বা Trachea, Bronchi এবং তার সঙ্গে যুক্ত ফুসফুসদ্বয় বা Lungs ও তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত। বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্তে মিশ্রিত করা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্ত থেকে বের করে দিয়ে রক্তকে বিশুদ্ধ করা শ্বসনতন্ত্রের কাজ।
- **রক্তসংবহনতন্ত্র (Cardio Vascular System):** এর মধ্যে আছে হৃৎপিন্ড বা Heart, ধমনী বা Artery, শিরা বা Vein এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত সরু ও সূক্ষতম ধর্মনী ও শিরার নালিকাগুলো। রক্তসবহন তন্ত্রের কাজ- রক্তসঞ্চালন, অক্সিজেন পরিবহণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহণ, খাদ্যসার পরিবহণ, সঞ্চিত খাদ্য পরিবহণ, হরমোন পরিবহণ, দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি।
- **লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System):** লসিকা, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা নালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়। লসিকার কাজ- প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ, প্রোটিন পরিবহণ, তৈলাক্ত বা স্নেহ পদার্থ পরিবহণ, পুষ্টি, শোষণ, দেহ রসের পুনর্বণ্টন প্রভৃতি।
- **পরিপাকতন্ত্র (Digestive System):** মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র , যকৃত, অগ্নাশয়, পিত্তথলি প্রভৃতি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়। পরিপাকতন্ত্রের কাজ- খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ, বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ প্রভৃতি এই তন্ত্রের কাজ।

- **রেচনতন্ত্র (Urinary System):** এক জোড়া বৃক্ক, এক জোড়া রেচন নালী বা ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও মূত্রনালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। রেচনতন্ত্রের কাজ- রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করা, রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা, ভিটামিন ডি ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়া, দেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
- **জননতন্ত্র (Reproductive System):** পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। জননতন্ত্রের কাজ- মানুষের বংশবৃদ্ধি করা, পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেট শুক্রাণু, ডিম্বাণু সৃষ্টি ও নিষেক করা।
- **অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (Endocrine System)** পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারা থাইরয়েড, এড্রেনাল প্রভৃতি গ্রন্থি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়। অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের কাজ দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ, জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্য নিয়ন্ত্রণ, মাতৃদেহে দুধ ক্ষরণ ও নিয়ন্ত্রণ, বিপাক বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা।
- **স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System):** এই তন্ত্র মস্তিস্ক (Brain) ও তা থেকে ছড়িয়ে পড়া সুষুম্না কান্ড (Spinal Cord) এবং তার সঙ্গে অসংখ্য স্নায়ু (Nerves) নিয়ে গঠিত। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ- অনুভূতি গ্রহণ, পরিবহণ, সমন্বয় এবং স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করা।
- **ত্বকতন্ত্র (Integumentary system)** দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। শরিরের সবচেয়ে বড় এই অঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত, যা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ত্বক, চুল, নখ, ঘর্ম গ্রন্থি এবং তৈল গ্রন্থি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। বহিরাবরণ তন্ত্রের কাজ দেহের প্রতিরক্ষা, তাপ নিয়ন্ত্রণ, জলীয় পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়াও বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

বিশেষ অনুভূতির অঙ্গসমূহ (Special Sense Organs): মানুষের বিশেষ বিশেষ অনুভূতি ও কাজের জন্য যে সব অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় তাকে বিশেষ অনুভূতির অঙ্গ (Special Sense Organs) বলা হয়। সেগুলো হলো –

১। জিহ্বা বা Tongue যার দ্বারা আমরা স্বাদ গ্রহণ করি।
২। চক্ষু বা Eye যার দ্বারা আমরা দর্শন করি।
৩। নাক বা Nose যার দ্বারা আমরা ঘ্রাণ উপভোগ করি।
৪। কান বা Ear যার দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি।
৫। চর্ম বা Skin যার দ্বারা আমরা স্পর্শ অনুভব করি।

মানবদেহের তরল পদার্থ

মানব দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর তরল পদার্থ (Body Fluids) রয়েছে। মানব দেহের তরল পদার্থ (Fluids) মূলত দুইটি ভাগে বিন্যাস করা হয়-

আন্তঃকোষ তরল পদার্থ (Intracellular Fluids)- মানবদেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যস্থিত তরলকে আন্তঃকোষ তরল পদার্থ (Intracellular Fluids) বলে যা পদার্থ শরীরের মোট ওজনের ৪০%।

বহিঃকোষ তরল পদার্থ (Extracellular Fluids)- দেহের বিভিন্ন কোষের বাইরে এই তরল পদার্থ থাকে। যা শরীরের মোট তরল পদার্থের শতকরা ২০% ভাগ। বহিঃকোষ তরল পদার্থ তিনটি ভাগে বিভক্ত –

২০২৩

ক) কোষসমূহের মধ্যবর্তী তরল পদার্থ (Interstitial Fluids),
খ) রক্তের তরল পদার্থ (Blood Plasma),
গ) ট্রান্সসেলুলার তরল পদার্থ (Transcellular Fluid)।

কোষসমূহের মধ্যবর্তী তরল পদার্থের উদাহরণ- ক্যাপিলারি ফ্লুইড।

ট্রান্সসেলুলার তরল পদার্থের উধাহরণ: ক) সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal Fluid); খ) সাইনোভিয়াল ফ্লুইড (Synovial Fluid); গ) পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড (Peritoneal Fluid); ঘ) পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড (Pericardial Fluid); ঙ) ইন্ট্রাঅকুলার ফ্লুইড (intraocular Fluid) প্রভৃতি।

রক্তের তরল পদার্থ বা (Blood Plasma)-এর পরিমাণ শরীরের মোট ওজনের ৫% বা প্রায় ৩ লিটার। এর কাজ বহন করা। বহিঃকোষ তরল পদার্থের সঙ্গে রক্তের তরল পদার্থের যে আদান-প্রদান চলে তা প্রত্যক্ষভাবে হয় না। প্লাজমার চাপ বা Hydrostatic Pressure থাকে বেশি। তাই প্রস্বেদন প্রক্রিয়া (Osmosis) দ্বারা এই আদান-প্রদান (Fluid Exchange) হয়ে থাকে। প্লাজমাতে প্রোটিন আছে, যা বহিঃকোষ তরল পদার্থের মধ্যে তা নেই। এই সব তরল পদার্থের অভাব হলে তা পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। তরল পদার্থের অভাব প্রকট হলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেমন: কলেরা জনিত ডাইরিয়া হলে অথবা অতিরিক্ত রক্তপাত হলে মানুষের শরীরে তরল পদার্থের অভাব প্রকট হয়ে পরে। এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অবস্থানভেদে মানবদেহে দুধরনের অঙ্গ আছে। বাহ্যিক অঙ্গ-চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি। আর অভ্যন্তরীণ অঙ্গ- জীবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলো যেমন- পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিন্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি। পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শরীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেওয়া হলো।

পরিপাক: মানবদেহের কোষ গুলোকে সজীব এবং কার্যকর রাখার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল এবং জৈব যৌগ অবস্থায় গ্রহণ করা হয় যা দেহের কোষগুলো সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। খাদ্যকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেঙে সহজ, সরল এবং তরল অবস্থায় রূপান্তর করাকে পরিপাক বলে। দেহ দুভাবে খাদ্য পরিপাক করে- যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়া: খাদ্যদ্রব্য মুখগহবরে দাঁতের সাহায্যে চিবানো হয়। প্রথমত চিবানোর ফলে খাদ্য ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। পাকস্থলি এবং অন্ত্রের মধ্যে এই টুকরা খাদ্যবস্তুগুলো মন্ডে পরিণত হয়।

রাসয়নিক প্রক্রিয়া: রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফলে জটিল উপাদানগুলো ভেঙে দেহের গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত হয়।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System): পৌষ্টিকনালি এবং কয়েকটি গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয়। বিস্তৃত এই নালিপথ কোথাও সরু,আবার কোথাও প্রশস্ত। এর প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ:

(ক) **মুখ (Mouth)**: মুখ থেকে পৌষ্টিকনালি শুরু। এটি নাকের নিচে আড়াআড়ি একটি বড় ছিদ্র, যেটি উপরে এবং নিচে ঠোঁট দিয়ে বেষ্টিত থাকে।

(খ) **মুখগহবর (Buccal cavity)**: মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহবা ও লালাগ্রন্থি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহবা খাদ্যকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে। কানের নিচে চোয়ালের পাশে জিহবার

নিচে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে গলধ:করণে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।

(গ) **দাঁত (Tooth):** মানবদেহে সবচেয়ে শক্ত অংশ দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহ্বরে উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত ১৬ টি করে মোট ৩২ টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার গজায়। প্রথমবার শিশুকালে দুধ দাঁত, দুধ দাঁত পড়ে গিয়ে১৮ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থায়ী দাঁত গজায়। স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। সেগুলো হচ্ছে-

- কর্তন দাঁত (Incisor): এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।
- ছেদন দাঁত (Canine): এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেড়া হয়।
- অগ্রপেষণ দাঁত (Premolar): এই দাঁত দিয়ে চর্বণ, পেষণ উভয় কাজ কৰা হয়।
- পেষণ দাঁত (Molar): এই দাঁত চর্বণ ও পেষণে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) **গলবিল (Pharynx):** মুখগহ্বরের পরে পৌষ্টিকনালির অংশ হল গলবিল। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌছে।

(ঙ) **অন্ননালি (oesophagus):** গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে পৌছে।

(চ) **পাকস্থলী (Stomach)**: অন্ননালি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশি বহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে মন্ডে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(ছ) **অন্ত্র (Intestine)**: পাকস্থলীর পরে পৌষ্টিকনালির অংশ হল অন্ত্র। এটি একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি। এর দুটি প্রধান অংশ- ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র।

- **ক্ষুদ্রান্ত (Small Intestine):** পাকস্থলী থেকে বৃহদান্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাঁচানো নলটিকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশ- ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ডিওডেনামে পিত্তথলি পিত্তনালির মাধ্যমে যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি হয়ে অগ্ন্যাশয় রস ডিওডেনামে এসে পৌঁছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে আন্ত্রিক গ্রন্থিও থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে, এদের ভিলাই বলে। ভিলাই পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।
- **বৃহদন্ত্র (Large Intestine):** ইলিয়াম থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদান্ত্র। বৃহদান্ত্রের তিনটি অংশ- সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে। বৃহদন্ত্রে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় এবং মল জমা থাকে।
- **পায়ু (Anus):** পৌষ্টিক নালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথই হলো পায়ু।

শ্বসন (Respiration): জীবন ধারণের জন্য চলন, ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধি, প্রজনন প্রভৃতি জৈবিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তির প্রধান উৎস সূর্যালোক। সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্থিতি শক্তিরূপে (Potential energy) সঞ্চিত করে। এই শক্তি জীব তার জীবন ধারণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। শ্বসনের সময় জীবদেহে এই স্থিতি শক্তি রাসায়নিক শক্তি (ATP) হিসেবে তাপরূপে মুক্ত হয় এবং জীবের বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু ছাড়াও প্রোটিন, ফ্যাট এবং বিভিন্ন জৈব এসিড শ্বসনিক বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। জীবদেহে এই জটিল যৌগগুলো প্রথমে ভেঙে সরল যৌগে পরিণত হয় এবং পরে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP) রূপান্তরিত হয়।

শ্বসনের প্রকারভেদ: শ্বসনের সময় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্বসনকে দুভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন। **সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)-** যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনই হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া। **অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)-** যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

মানব শ্বসনতন্ত্র: অক্সিজেন জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদান। মানবদেহে বাতাসের সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অংশে পৌঁছায়। দেহকোষে পরিপাক হওয়া খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে, ফলে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন এবং খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। এ উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। সেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়া দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয়, তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণিদেহের খাকসুকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে জারিত করে মজুত শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিস্কাশন করে, তাকে শ্বসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান-প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। শ্বসন ছাড়া আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তিন-চার মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। শ্বসনতন্ত্রকে কাজের উপর ভিত্তি করে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) পরিবহণকারী অংশ ; খ) শ্বসনকারী অংশ ।

ক) পরিবহণকারী অংশ: শ্বসনতন্ত্রের এই অংশটি কতকগুলো বায়ু পরিবহণকারী নালী নিয়ে গঠিত যা দেহের বহিঃপরিবেশ ও ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময়স্থলের মধ্যে সংযোগ করে। এটি নিম্নবর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত। ১) নাক বা নাসিকা (Nose) ২) গলবিল (Pharynx) ৩) ল্যারিংক্স (Larynx) ৪) শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া (Trachea) ৫) ব্রঙ্কাই (Bronchi)

১। নাসিকা (Nose): নাক হচ্ছে অস্থি, তরুণাস্থি, পেশি ও যোজক কলানির্মিত একটি ফাঁপা অঙ্গ। এর ত্বক অসংখ্য তেল গ্রন্থি ও কিছু লোমবিশিষ্ট। ত্বকটি সম্মুখে নাসাছিদ্র অতিক্রম করে নাকের ভেস্টিবল (Vestibule) এ প্রসারিত। এখানকার এপিথেলিয়াম স্তরীভূত ও আঁইশাকার এবং কতকগুলো শক্ত লোমবাহী। নাসিকার অন্তঃস্থ গহবরটি নাস গহবর (Nasal cavity) যা একটি পাতলা ব্যবধায়কে ডান ও বাম অর্ধে বিভক্ত। এর প্রাচীর সিলীয় এপিথেলিয়ামে আবৃত, মিউকাস ঝিল্লি বেষ্টিত এবং রক্ত বাহিকা ও স্নায়ু প্রান্ত সমৃদ্ধ। নাসা গহবরের উপরের অংশের মিউকাস ঝিল্লি সংবেদী অলফ্যাক্টরী কোষযুক্ত।

নাসিকার কাজ: নাসিকা প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে; প্রশ্বাস বায়ুতে যে সব ধূলিকণা বা রোগজীবাণু থাকে, লোম ও শ্লেষ্মাঝিল্লি সেগুলোকে আটকে রাখা এবং ছাকনির মতো কাজ করে; নাসাপথ অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

২। গলবিল (Pharynx): নাসাগহবর পিছনদিকে দুটি ছিদ্র পথে নাসাগলবিল (Nasopharynx) এ উন্মুক্ত হয়। এরপর বাতাস মুখগলবিল (Oropharynx) অতিক্রম করে ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে।

৩। স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স (Larynx): এটি গলবিলের নিম্নাংশের সামনের দিকে অবস্থিত এবং শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ও ছোট ছোট খন্ডবিশিষ্ট তরুণাস্থি নির্মিত অংশ। তরুনাস্থিগুলো অস্থি সংযোজক সন্ধি-বন্ধনী ও ঝিল্লিতে

আবদ্ধ। উপরিভাগের তরুণাস্থির উপরে এপিগ্লটিস (Epiglottis) নামে একটি জিহবাকৃতির ঢাকনা থাকে। ল্যারিংক্সের গহবরে একজোড়া স্থিতিস্থাপক, পর্দার মত স্বরতন্ত্রী (Vocal cord) থাকে।

ল্যারিংক্সের কাজ: খাদ্য গ্রাসের সময় এপিগ্লটিস (উপজিহবা) স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখা, যাতে খাদ্যদ্রব্য ল্যারিংক্সে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে; স্বরতন্ত্রীর কাঁপনের ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়। কথা বলতে বা কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে মুখ স্বরতন্ত্রী একসাথে ব্যবহৃত হয়।

৪। **ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী (Trachea)**: এটি লিগামেন্ট সংযুক্ত কতগুলো অর্ধবৃত্তাকার তরুনাস্থি নির্মিত প্রায় ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২.সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ফাঁপা নল। এর পশ্চাৎ প্রাচীর নরম এবং যোজক কলার ঝিল্লি নির্মিত ও অন্ননালী সংলগ্ন। ট্রাকিয়ার অন্তর্গাত্র মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত। এতে মসৃণ পেশিতন্তু, সিলিয়া ও মিউকাস-নিঃসারী গ্রন্থি থাকে। শ্বাসনালীর বহিঃপ্রাচীর যোজক কলার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীর কাজ: শ্বাসনালীর মাধ্যমে বাতাস দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; বিরক্তিকর কোনো বস্তু ট্রাকিয়ায় ঢুকে গেলে ঝিল্লির সূক্ষ্ম রোম কাশির উদ্রেক করে তা উপরের দিকে পাঠিয়ে দেয় এবং ট্রাকিয়া পরিষ্কার রাখা।

৫। **ব্রঙ্কাই (Bronchi):** ট্রাকিয়া বক্ষ গহবরে প্রবেশ করে ৪র্থ বা ৫ম থোরাসিক কশেরুকার লেভেলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে দুটি শাখার সৃষ্টি করে, তাদের ব্রঙ্কাই বলে। প্রথম সৃষ্ট এ ডান ও বাম শাখাকে ব্রঙ্কাই (Bronchi) বলে। এরা যথাক্রমে ফুসফুসের ডান ও বাম খন্ডে প্রবেশ করে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এদের বলে ব্রঙ্কিওল (Bronchiole)। ব্রঙ্কাইয়ের প্রাচীর ট্রাকিয়ার মতই। ডান শাখাটি বাম শাখা অপেক্ষা চওড়া কিন্তু খাটো।

খ) শ্বসনকারী অংশ: শ্বসনকারী অংশের অঙ্গসমূহ যা ফুসফুসের ভেতরে থাকে :

ব্রঙ্কিওল (Bronchiol); এলভিওলার নালী (Alveolar duct); এলভিওলাই (Alveoli)

১) ব্রঙ্কিওল মানুষের ফুসফুস বক্ষ গহবরে ডায়াফ্রামের উপরে হৃদপিন্ডের দুইপাশে অবস্থিত হালকা লাল রঙের কোণাকার অঙ্গ। ফুসফুসের অভ্যন্তরে অবস্থিত শাখা নালীগুলোকে ব্রঙ্কিওল বলে। ব্রঙ্কিওলের প্রান্তে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল অবস্থিত। এটি অসংখ্য এলভিওলার থলি নিয়ে গঠিত। মানবদেহে ডান ও বাম এ দুটি ফুসফুস (Lungs) রয়েছে। এ দুটি আবার খাঁজের সাহায্যে খন্ডে (Lobe) বিভক্ত। ডান ফুসফুস তিন খন্ডবিশিষ্ট এবং বাম ফুসফুস দুই খন্ডবিশিষ্ট।

২) এলভিওলার নালী ব্রংকিওলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তগুলোকে এলভিওলার নালী (Alveolar duct) বলে। প্রতিটি নালী একেকটি এলভিওলার থলিতে (Alveolar sac) উন্মুক্ত হয়।

৩) এলভিওলাই প্রতিটি এলভিওলার থলি কতকগুলো এলভিওলাই (Alveoli) নিয়ে গঠিত। ফুসফুসের বহির্তল দ্বিস্তরী ভিসেরাল প্লুরা (Visceral pleura) ঝিল্লিতে আবৃত।

শ্বসন পদ্ধতি (Respiration): শ্বসন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন পরিবাহিত হয়ে গ্রহণ করা খাদ্যকে জারিত (Oxidation) করে বিপাকের (Metabolism) জন্য দেহ কোষে নিয়ে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থকে কোষ থেকে পরিবেশে নিয়ে আসে। শ্বসন দুই পর্যায়ে হয়, যথা-

১) বহিঃশ্বসন (External respiration)

২) অন্তঃশ্বসন (Internal respiration)।

বহিঃশ্বসন (External respiration): এতে অক্সিজেন শ্বসিত হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের করে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে অর্থাৎ অক্সিজেন ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে বহিঃশ্বসন বলে। ফুসফুসের এলভিওলার বাতাস (Alveolar air) ও এলভিওলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিক জালিকার রক্তের মধ্যে এই বিনিময় ঘটে। প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাসে O_2 এর চাপ ফুসফুসের রক্তের O_2 এর চাপ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন এলভিওলাস থেকে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে প্রবেশ করে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। কিছু পরিমাণ O_2 রক্তরসেও দ্রবীভূত হয়। একই সাথে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে (CO_2) এর চাপ এলভিওলাসে (CO_2) এর চাপের চেয়ে বেশি হওয়ার ফুসফুসের কৈশিকজালক থেকে (CO_2) এলভিওলাসে প্রবেশ করে।

বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা -

ক) প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration or inhalation) এবং

খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration or Exhalation)।

শ্বাসগ্রহণ (Inspiration): ফুসফুসের বাতাস (Air) গ্রহণ করা। এতে সময় লাগে দুই সেকেন্ড।

শ্বাসত্যাগ (Expiration): ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দেয়া এতে সময় লাগে তিন সেকেন্ড।

শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্য: অক্সিজেন সরবরাহ করা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করা; অ্যামোনিয়া, কিটোন বডি, অপ্রয়োজনীয় তেল, পানি, অ্যালকোহল প্রভৃতি বের করে দেওয়া; রক্তের পানি ও অন্যন্য অংশের সমতা রক্ষা করা; শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করা। প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়া ও শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। শ্বাসকার্যের কোনো বিরাম নেই। ঘুমের সময় কিছু কম থাকে, পরিশ্রম বা ব্যায়ামের সময় তা বেড়ে যায়। প্রতি মিনিটে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষ ১২-১৮ বার এবং নবজাত শিশু ৪০ বার শ্বাস ক্রিয়া করে থাকে।

প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ: স্নায়ু উদ্দীপনার প্রভাবে ডায়াফ্রামের পেশি (বৃত্তাকার অরীয় পেশিতন্তু) এবং প্রতিজোড়া পর্শুকার মাঝখানে অবস্থিত বহিঃ ও অন্ত ও ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন প্রসারণ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পর্যায়টি নিম্নেরূপভাবে সম্পন্ন হয়-

ক) বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকুচিত হয় এবং অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল শিথিল হয়। ফলে পাঁজর উপরের দিকে উঠে যায়।
খ) তখন ডায়াফ্রাম-পেশিও সংকুচিত হয়, ফলে ডায়াফ্রাম সমতল হয়ে যায়।
গ) উপরোক্ত দুই কর্মকান্ডের ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যায় (বুক প্রসারিত হয়)। এতে বক্ষগহ্বর ও ফুসফুস অভ্যন্তরীণ চাপ বায়ুমন্ডলীর চাপের চেয়ে কমে যায়।
ঘ) এ কারণে বাতাস নাসাপথের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং এলভিওলাই ফুলে উঠে। ফুসফুস ও বায়ুমন্ডলীয় বাতাসের চাপ সমান না হওয়া পর্যন্ত বাতাসের চাপ অব্যাহত থাকে।

নিঃশাস বা শ্বাসত্যাগ: এটি প্রশ্বাসের পরই সংগঠিত একটি নিষ্ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য তা ঘটে। নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়, উদরীয় পেশীগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মত বেকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়, ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং প্লিরার (Pleura) অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকাপথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

অন্তঃশ্বসন (Internal respiration): শ্বসনের এই ধাপ কলায় সংঘটিত হয়। অন্তঃশ্বসনে দেহকোষ দ্বারা বিপাকের জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেওয়া হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত থেকে অক্সিজেন কলা-কোষে প্রবেশ ও কোষমধ্যস্থ খাদ্যের তরল পদার্থ রক্তের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষ থেকে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময় (Gaseous exchange) হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।

জব ১| প্রাণীকোষ ও এর অঙ্গানু চিহ্নিত করার দক্ষতা

পারদর্শিতার মানদন্ডঃ

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- জীব কোষ ও কোষের বিভিন্ন কোষাঙ্গানু চিহ্নিত করা।
- কোষাঙ্গানু চিহ্নিত করার জন্য অনুবিক্ষন যন্ত্র নির্বাচন করা।
- কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়েজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস ও ইকুইপমেন্ট)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২.	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩.	অনুবিক্ষণ যন্ত্র	নমুনা মতাবেক	১টি
৪.	মডেল	নমুনা মতাবেক	১টি

মালামাল (Materials)

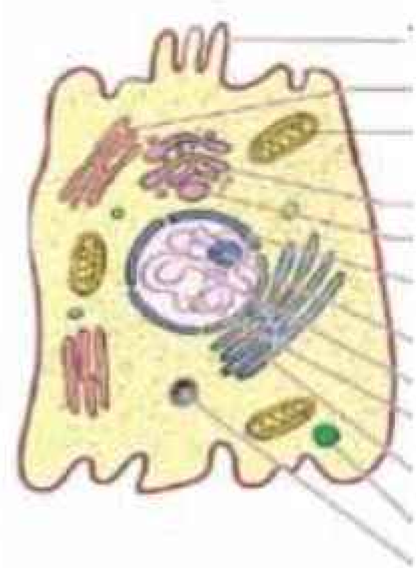
ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
২	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	

কোষের গঠন ও অঙ্গানু চিহ্নিত করার কৌশলসমূহ

১. ছবিতে চিহ্নিত অঙ্গানুগুলোর শনাক্ত করা

২. শনাক্তকৃত অঙ্গানুগুলোর নাম পাশে লিখা

৩. অঙ্গানুগুলোর কাজ উল্লেখ করা



কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী শনাক্ত করার ড্রয়িং বুঝে নাও;
- অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার উপযোগি কর;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;
- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ শনাক্ত কর;
- চিহ্নিত করার পর মার্ক করা নমুনার নাম ও এর কাজ লিখ;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও;

কাজের সতর্কতা: নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হওয়া।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জীববিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?
২. কোষ বলতে কি বুঝায়?
৩. কোষ অঙ্গানুর নাম উল্লেখ কর।
৪. নিউক্লিয়াস কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টিস্যু কত প্রকার? উল্লেখ কর ?
২. অস্থিসন্ধি বলতে কি বুঝায়? এর কাজ কী?
৩. মানুষের চলনে অস্থি ও পেশীর ভূমিকা উল্লেখ কর।
৪. রক্ত কী? এর কাজ কী?
৫. পরিপাকতন্ত্রের কাজ কী?
৬. শ্বসন কত প্রকার ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কোষের কাজ বর্ণনা কর।
২. টিস্যু কী? এর কাজ উল্লেখ কর।
৩. অস্থিতন্ত্রের কাজ উল্লেখ কর।
৪. রক্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৫. হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৬. মানবদেহের শ্বসন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা

Basic Health Screening





আমরা প্রায়শই দেখি ডাক্তার-নার্সরা হাসপাতাল বা ক্লিনিকে রোগীদের শরীরে বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন: থার্মোমিটার, রক্তচাপ মাপার মেশিন, স্টেথোস্কোপ কিংবা খালি হাতে বা খালি চোখে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। এটি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে বা মানবদেহের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নামে পরিচিত। অনেক সময় নিজের বাড়িতেও আমরা অসুস্থ কারো সাধারণ এই ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকি। অর্থাৎ, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো জানা থাকলে এবং উল্লেখিত যন্ত্রাদি ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ কিছু দক্ষতা থাকলে যেকোনো মানুষই প্রয়োজনের সময় চট করে পরিমাপ করে ফেলতে পারে মানবদেহে রক্তের চাপ, নাড়ির গতি তাপমাত্রা প্রভৃতি। আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক এবং মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি কিভাবে খুব সহজ ও সঠিক উপায়ে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজটি সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করতে পারব
- নাড়ির গতি পরিমাপ করতে পারব
- শ্বাসপ্রশ্বাস পরিমাপ করতে পারব
- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব
- রক্তচাপ পরিমাপ করতে পারব
- মানবদেহের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে লিপিবদ্ধ ও প্রয়োজনে ডাক্তারকে অবহিত করতে পারব।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন, নাড়ির গতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, তাপমাত্রা ও রক্তচাপ পরিমাপ করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই আমরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৪.১ সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা হেল্‌থ স্ক্রিনিং (Health Screening)

স্বাস্থ্য সেবাপ্রার্থী যেকোনো রোগী বা ব্যক্তিকে প্রথমেই কিছু সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যার মাধ্যমে একজন সেবাপ্রদানকারী (Service Provider) রোগীটি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করে। এগুলোকে বলা হয় সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা বেসিক হেল্‌থ স্ক্রিনিং যা রোগীর কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা বা রোগের প্রাথমিক অবস্থা শনাক্তকরণের একটি কার্যকর উপায়, এমনকি যদি কোনো রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ নাও থাকে।

সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলতে আমরা সাধারণত মানবদেহের চারটি মৌলিক লক্ষণ (vital signs) যেমন: শরীরের তাপমাত্রা, রক্তচাপ, নাড়ির গতি বা হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি (Respiration Rate) পরিমাপ করে থাকি। এছাড়াও আরো কিছু সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন শরীরের ওজন ও উচ্চতা, রক্তের গ্লুকোজ বা শর্করার মাত্রা পরিমাপ বা প্রস্রাবের প্রকৃতি বা পরিমাণ জানতে পারি। এই পরীক্ষাগুলো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সাধারণত ডাক্তার বা নার্স পরিমাপ করে থাকেন। তবে নির্দেশনা অনুযায়ী কেয়ারগিভারও পরিমাপ করতে পারেন। আবার বৃদ্ধাশ্রম কিংবা হোম কেয়ার সেটিংসে যেহেতু কেয়ারগিভারই রোগীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সেহেতু এই বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে একজন কেয়ারগিভারকেই সঠিকভাবে পরিমাপ করে লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং প্রয়োজনে চিকিৎসককে অবহিত করতে হয়।

তবে পূর্নাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলতে এর চেয়ে আরো অনেক বেশিকিছু বোঝানো হয়, যেটি একজন ডাক্তারের নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রুটিন কিছু টেস্টও অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসকগণ রোগীর সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্নয় করে থাকেন। তবে এই অধ্যায়ে আমরা কেবল সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করব যাতে করে কর্মক্ষেত্রে আমরা এই দক্ষতাগুলো পেশাদারিত্বের সাথে প্রয়োগ করতে পারি।

৪.১.১ শারীরিক পরীক্ষা বা ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট (Physical Assessment)

শারীরিক পরীক্ষা বা ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট রোগীর রোগ নির্নয়ের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি অত্যাবশ্যকীয় কৌশল। ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ কোনো রোগীর শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য চারটি মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে:

ক. ইনস্পেকশন (Inspection): ইনস্পেকশন এর অর্থ হলো চোখ দিয়ে দেখা। কোনো রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় চোখ দিয়ে দেখে (ভিশন) শরীরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা করা যায়। খালি চোখে আমরা রোগীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা, রঙ বা কালার, আকার-আকৃতি, গঠন বা টেক্সচার (Texture), প্রতিসাম্য (Symettrey), নড়াচড়া প্রভৃতি বিষয় নির্নয় করতে পারি। এটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার একেবারে প্রথম ধাপ। গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল সাইন শ্বাসপ্রশ্বাসের হারও আমরা ইন্সপেকশনের মাধ্যমে বুক ও পেটের উঠানামা দেখে পরিমাপ করে থাকি।



চিত্র ৪.১: ইনস্পেকশনের মাধ্যমে শ্বাসপ্রশ্বাস দেখা হচ্ছে।

খ. পালপেশন (Palpation): পালপেশন মানে হলো রোগীর শরীর স্পর্শ করে পরীক্ষা করা। এই স্পর্শ বা পালপেশন আবার দুই রকম; লাইট পালপেশন বা হালকা স্পর্শ এবং ডীপ পালপেশন বা গভীর স্পর্শ। শরীরের কোনো অস্বাভাবিকতা বোঝার জন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা বডি পার্টস পালপেট করতে হয়। লাইট পালপেশনের মাধ্যমে আমরা শরীরের উপরিভাগের গঠন, কোমলতা বা টেন্ডারনেস, টেমপারেচার বা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, স্থিতিস্থাপকতা. স্পন্দন, টিউমার প্রভৃতি পরীক্ষা করতে পারি। এটার জন্য হাতের আংগুলের ডগা (Finger Pad) দিয়ে খুব আলতোভাবে আধা ইঞ্চি পর্যন্ত চামড়ার উপর চাপ দেওয়া হয়। আবার ডীপ পালপেশনের ক্ষেত্রে চামড়ার উপর দিয়ে দেড় বা দুই ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর চাপ দেওয়া হয়। অনেক সময় অধীক চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হলে দুই হাত একসাথে রেখে গভীর চাপ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আমরা শরীরের ভিতরের অরগান যেমন কিডনী, পাকস্থলী প্রভৃতি অঙ্গের আকার-আকৃতি, ব্যথা ও এর প্রকৃতি, প্রতিসাম্যতা, অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করতে পারি।



চিত্র ৪.২: লাইট ও ডীপ পালপেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গ. পারকাশন (Percussion): পারকাশন বলতে আঙ্গুল বা হাত দিয়ে দ্রুত এবং তীক্ষ্ণভাবে রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে টোকা দিয়ে পরীক্ষা করাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান, আকৃতি-প্রকৃতি, সীমানা, অবস্থান প্রভৃতি বিষয় শনাক্ত করা যায়। শরীরের কোনো অভ্যন্তরীণ অঙ্গে যেমন কিডনি বা ফুসফুসে পানি বা গ্যাসীয় পদার্থ আছে কিনা তা শনাক্ত করতেও পারকাশন ব্যবহার করা হয়। পারকেশন দুই প্রকার: ডাইরেক্ট বা সরাসরি পারকাশন এবং ইনডাইরেক্ট বা পরোক্ষ পারকাশন। ডাইরেক্ট পারকাশনে হাতের একটি বা দুটি আঙ্গুলের সাহায্যে রোগীর শরীরে সরাসরি টোকা দেওয়া হয়। আর ইনডাইরেক্ট পারকাশনে একটি হাত রোগীর শরীরে রেখে সেই হাতের উপরে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে একইভাবে টোকা দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই টোকার প্রকৃতি ও শব্দ লক্ষ করা হয়। রোগীর ব্যথা আছে কিনা সেটা রোগীকে জিজ্ঞেস করে এবং তার মুখায়াভব দেখেও

বোঝা যায়। অনেক সময় বিশেষ একধরনের হাতুড়ি দিয়ে এটি করা হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় পারকাশন হ্যামার।



ক. ডাইরেক্ট পারকাশন; খ. ইনডাইরেক্ট পারকাশন; ও গ. পারকাশন হ্যামার
চিত্র ৪.৩: বিভিন্ন ধরনের পারকাশন

ঘ. অসকালটেশন (Auscultation): স্টেথোস্কোপ নামক একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ইন্টার্নাল অরগান বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ যেমন: ফুসফুস, হার্ট বা হৃৎপিন্ড কিংবা অন্ত্রের শব্দ (বাওয়েল সাউন্ড) শোনার কৌশলকেই অসকালটেশন বলা হয়। এই শব্দের মাধ্যমে অরগানটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যেমন: সেখানে পানি বা গ্যাস জমে গেছে কিনা, অস্বাভাবিক কোনো ফিজিওলোজি আছে কিনা প্রভৃতি। এ জন্য একটু নিরিবিলি পরিবেশ হলে শব্দ ভালোভাবে শোনা যায়।



চিত্র ৪.৪: স্টেথোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে হৃদ কম্পন শোনা হচ্ছে

হেল্থ স্ক্রিনিং- এর গুরুত্ব (Importance of Health Screening)

সুস্থ অসুস্থ সকলের জন্যই সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর (সাধারণত ৬-১২ মাস) মানুষের শরীরে সুপ্ত কোনো রোগ আছে কি না তার পরীক্ষা করার নামই হেল্থ স্ক্রিনিং। অনেক দেশেই হেল্থ ইন্সুরেন্স-এর প্রচলন অতটা না থাকায় কোনো সমস্যা দেখা না দিলে কেউ নিজের টাকা খরচ করে ডাক্তারের কাছে যেতে চান না। কিন্তু এই অসতর্কতা জীবনে অনেক সময় বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক বিশেষ করে যাদের বয়স ৪০ বছর বা তার বেশি তাদের জন্য হেল্থ স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি। হেল্থ স্ক্রিনিং এর মূল বিষয় হচ্ছে যে সমস্ত রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কোনো লক্ষণ থাকে না সেগুলোকে শনাক্ত করা। যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্ত চাপ, কিডনীর সমস্যা, হার্টের সমস্যা, রক্তের চর্বি বা কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, রক্ত শূন্যতা, মূত্রনালীতে বা শরীরের অন্য যেকোনো জায়গায় ইনফেকশন, পেটের

ভিতরে পিত্তথলি, কিডনি ও মূত্রথলিতে পাথর, জরায়ুর সমস্যা ইত্যাদি রোগসমূহ হেল্থ স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে অনেক প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা যায়। হেল্থ স্ক্রিনিংএ সাধারণত সিবিসি- (কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট), ফাস্টিং ব্লাড সুগার, সেরাম ক্রিয়েটিনিন, ইউরিন আরএমই, ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, লিপিড প্রোফাইল ইত্যাদি করতে দেওয়া হয়। এসব টেস্টের মাধ্যমে কোনো রোগের প্রাথমিক অবস্থা অথবা কারো কোনো পূর্বের অসুখ থাকলেও তার অবস্থা জানা যায়। শরীরের লুকিয়ে থাকা অসুখ জটিল আকার ধারণ করার আগেই হেলথ স্ক্রিনিং করা খুবই প্রয়োজন। তবে একজন কেয়ারগিভার হিসেবে আমরা মানবদেহের তাপমাত্রা, নাড়ির গতি, ব্লাড প্রেসার, প্রশ্বাসের হার, শ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমেই হেল্থ স্ক্রিনিং এর প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করব। এগুলোকে বলা হয় ভাইটাল সাইন্স বা মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণসমূহ। এর পাশাপাশি মানবদেহের উচ্চতা, ওজন, বডি ম্যাস ইনডেক্স, তরল পদার্থের ইনটেক ও আউটপুট দেখা, রক্তের গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদিও হেল্থ স্ক্রিনিং এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো একজন কেয়ারগিভার সহজেই তার কর্মক্ষেত্রে অনুশীলন করতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষা সাধারণত কোনো রোগ সরাসরি ডায়াগন সিস করে না, এটা অনুমেয় স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

৪.২ ভাইটাল সাইন (Vital Sign)

৪.২.১ ভাইটাল সাইন কি?

ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ হল কোনো ব্যক্তি বা রোগীকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় কতগুলো শরিরবৃত্তীয় সাইন বা লক্ষণ। এই পরিমাপগুলো একজন ব্যক্তির সাধারণ শারীরিক স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। মূলত চার ধরনের ভাইটাল সাইন আছে।যথা: তাপমাত্রা, স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার এবং রক্তচাপ। কোনো ব্যক্তির দেহে ভাইটাল সাইনগুলো স্বাভাবিক পরিমাপের চেয়ে কম বা বেশি হয়ে গেলে সেটি নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার কারণে হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। তখন চিকিৎসক আরো উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন। প্রধান ৪ প্রকার ভাইটাল সাইন নিম্নরুপ:

ভাইটাল সাইনের নাম	সহজে মনে রাখার উপায়
১। তাপমাত্রা (Temperature)	**T** (Temperature)
২। নাড়ির স্পন্দন (pulse / heart rate)	**P** (Pulse)
৩। শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiratory rate)	**R** (Respiration)
৪। রক্তচাপ (Blood Pressure)	**BP** (Blood Pressure)

টেবিল ৪.১: বিভিন্ন ধরনের ভাইটাল সাইন্স

এর পাশাপাশি আমরা মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন, বিএমআই, দেহে তরল পদার্থের ইনটেক ও আউটপুট, রক্তের শর্করা ও অক্সিজেনের পরিমাণও নির্ণয় করে থাকি।

৪.২.২ ভাইটাল সাইন পরিমাপের গুরুত্ব (Imporance of Measuring Vital Signs)

রোগীর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো বা ভাইটাল সাইন পর্যবেক্ষণ করা চিকিৎসা পেশাদারদের মধ্যে একটি সাধারণ অনুশীলন। স্বাস্থ্যসেবায় এর বিভিন্ন গুরুত্ব রয়েছে। যেমন:

১। রোগীর স্বাস্থ্য এবং ক্লিনিকাল ফলাফলগুলোতে মূল ভূমিকা পালন করা।

২। নিয়মিতভাবে লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত পেশাদারগণ রোগীর অবস্থার পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারেন।

৩। এটি প্রাথমিকভাবে রোগীর অবনতি শনাক্ত করতে এবং রোগীর ক্ষতি করতে পারে এমন সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

৪। গুরুতর লক্ষণগুলোর পরিবর্তন দ্রুত শনাক্তকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। হেল্থ স্ক্রিনিং-এ কোনো ব্যত্যয় ঘটলে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করতে বিলম্ব ঘটে এবং রোগীর আরোগ্যকে প্রলম্বিত করে ও মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখিন হয়। সুতরাং, ভাইটাল সাইন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় এক অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

৪.৩ তাপমাত্রা পরিমাপ

শারীরিক তাপমাত্রা চারটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি যা নিরাপদ এবং কার্যকর সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিমাপ করা হয়। শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোনো তীব্র অসুস্থতার প্রাথমিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে চিকিৎসকগণ তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং দক্ষতার ভিন্নতার কারণে তাপমাত্রার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তাই তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত কৌশলটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ভুল ফলাফল ব্যক্তির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

তাপমাত্রা: তাপমাত্রা হচ্ছে শরীরের তাপীয় অবস্থা যা মানবদেহের তাপপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, মানবদেহের শরীর কতটুকু ঠান্ডা বা কতটুকু গরম তাপমাত্রা দিয়ে তা বোঝা যায়।

তাপমাত্রা পরিমাপের গুরুত্ব: শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ধরনের রোগ শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত হয়। এটি একটি প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণ যা নির্ণয় করতে পারে যে একজন মানুষ অসুস্থ হতে চলেছে। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে রোগের চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে। দেহের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেহ তার স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবর্তন করে। জ্বর শরীরের তাপমাত্রায় রোগ বৃদ্ধির সর্বাধিক সাধারণ রূপ। এটি শরীরে সংক্রমণের প্রথম প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে তাড়াতাড়ি রোগ শনাক্ত করতে সহায়তা করে। হাইপোথ্যালামাস নামে পরিচিত মস্তিষ্কের কিছু অংশ দেহের ক্রিয়াকলাপের জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নিয়মিত দেহের তাপমাত্রাকে সামঞ্জস্য করে। যখন ইমিউন সিস্টেমটি শরীরে কোনো ভাইরাস অথবা সংক্রমনের উপস্থিতি শনাক্ত করে, তখন হাইপোথ্যালামাসকে তাপমাত্রা বাড়িয়ে চালু করার ইঙ্গিত দেয় যাকে আমরা জ্বর বলে অভিহিত করি। এটি দেহের অভ্যন্তরে একটি উষ্ণ এবং বৈরী পরিবেশ যা জীবাণুকে দুর্বল করে এবং প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। তাই দেহের তাপমাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা খুবই জরুরি, বিশেষ করে অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে।

তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র: তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম হল থার্মোমিটার। অর্থাৎ যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় তাকে **থার্মোমিটার** বলে। মানবদেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্যও থার্মোমিটার নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করা

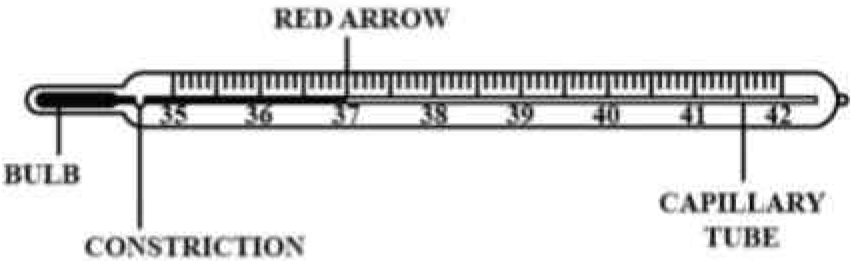
হয়। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার থার্মোমিটার রয়েছে, তবে মানবদেহের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য অধিক ব্যবহৃত এমন তিনটি থার্মোমিটার নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো:

১। ক্লিনিক্যাল বা গ্লাস থার্মোমিটার: এর প্রাধানত তিনটি অংশ। এর নিচের দিকে থাকে সরু মারকারি বাল্ব, মূল বডি কাচের গ্লাস দিয়ে আবদ্ধ এবং এর মাঝখানে থাকে লিকুইড মার্কারী বা পারদপূর্ণ কলাম যা দ্বারা তাপমাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করে। একে অনেক সময় পারদ বা মার্কারী থার্মোমিটারও বলা হয়ে থাকে। এটিতে ৯৪°- ১০৮° ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৫°-৪২° ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত স্কেল থাকে।

২। ডিজিটাল থার্মোমিটার: এটিরও নিচের দিকে থাকে সরু মারকারি বাল্ব, বডির মাঝখানে একটি ডিসপ্লে থাকে যেখানে তাপমাত্রা দেখা যায়। ডিসপ্লের উপরে একটু সুইচ থাকে যার মাধ্যমে থার্মোমিটারটি চালু এবং বন্ধ করা যায়। এর কোন স্কেল থাকে না তাপমাত্রা সরাসরি ডিসপ্লেতে দেখা যায়।

৩। ইনফ্রারেড থার্মোমিটার: এটি সাধারণ সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার জন্য পারদপূর্ণ অংশটি রোগীর শরীরে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন, সাম্প্রতিক করোনা মহামারির সময় আমাদের দেশেও এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেছে। এর উপরের ও সামনের দিকে একটা স্ক্যানার থাকে যা তাপমাত্রা নির্ণয় করে এবং পিছন দিকে একটা ডিসপ্লে থাকে যেখানে তাপমাত্রা দেখা যায়। ডিসপ্লের নিচের দিকে একটি সুইচ থাকে যার মাধ্যমে থার্মোমিটারটি চালু এবং বন্ধ করা যায়।

তবে ডিজিটাল ও ইনফ্রারেড থার্মোমিটার অনেক সময় ব্যয়সাধ্য বিধায় আমাদের দেশে হাসপাতাল, ক্লিনিক কিংবা বাসাবাড়িতে শরীরের তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে এনালগ থার্মোমিটারের ব্যবহার কিছুটা বেশি দেখা যায়। এটিকে আবার ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারও বলা হয়ে থাকে।



চিত্র ৪.৫: একটি জ্বর মাপার থার্মোমিটারের স্বাভাবিক গঠন

আবার শরীরের কোন অংশ থেকে তাপমাত্রা নেয়া হচ্ছে সেটির উপর নির্ভর করে থার্মোমিটারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:-

১। ওরাল থার্মোমিটার: সজ্ঞান রোগীর জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে ওরাল থার্মোমিটার। এ ধরনের থার্মোমিটার দিয়ে সাধারণত জিহ্বার নিচে একপাশে রেখে তাপমাত্রা মাপা হয়। এক্ষেত্রে থার্মোমিটারটি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে। মুখে তাপমাত্রা পরিমাপের ৫-১০ মিনিট পূর্বে কোন ঠান্ডা বা গরম খাবার গ্রহণ, ব্যায়াম বা ধুমপান করা যাবে না। এতে সঠিক তাপমাত্রা নাও আসতে পারে। ৫ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের মুখে তাপমাত্রা নেয়া যাবে না। আবার মুখে অস্ত্রপাচার হয়েছে, অজ্ঞান কিংবা মানসিক সমস্যা আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে মুখে তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

২। এক্সিলারি থার্মোমিটার: বাহুর নিচে (Armpit বা axilla) ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার রেখে তাপমাত্রা মাপা যায়। এটি শিশুদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান। এক্সিলারি তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১° ডিগ্রি ফারেনহাইট কম থাকে।

৩। রেকটাল থার্মোমিটার: পায়ুপথের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় রেকটাল থার্মোমিটার। সাধারণত যেসকল রোগীর মুখে তাপমাত্রা মাপতে পারে না (যেমন, অজ্ঞান রোগী, মুখে অপারেশন বা সার্জারী হয়েছে এমন রোগী) তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। পায়ুপথে তাপমাত্রা পরিমাপের সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ১ ইঞ্চি এবং বড়দের ক্ষেত্রে ১.৫ ইঞ্চি থার্মোমিটার পায়ু পথে প্রবেশ করাতে হবে। এক্ষেত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ করানোর সময় কখনোই জোরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না। পায়ুপথে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১° ডিগ্রি বেশি থাকে।

৪। টিমপেনিক থার্মোমিটার: টিমপেনিক থার্মোমিটারে একটি সেন্সর থাকে যার মাধ্যমে ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের মত কানের টিমপেনিক পর্দার তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৫° ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি পাওয়া যায়।

সাধারণত মুখের তাপমাত্রা মানবদেহের আদর্শ তাপমাত্রা নির্দেশ করে। এক্সিলারি তাপমাত্রার সাথে সাধারণত ১° ডিগ্রি ফারেনহাইট যোগ করে এবং রেকটাল বা পায়ুপথে প্রাপ্ত তাপমাত্রা থেকে ১° ডিগ্রি ফারেনহাইট বিয়োগ করলে তা মুখের তাপমাত্রার সমান হয়।



চিত্র ৪.৬: বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার

তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল ও সংকেত

মানবদেহের তাপমাত্রাকে সাধারণত দুটি স্কেলে পরিমাপ করা হয়। যেমন:

স্কেলের নাম	সংকেত
১। সেলসিয়াস স্কেল	°C
২। ফারেনহাইট স্কেল	°F

এক স্কেল থেকে অন্য স্কেলে তাপমাত্রা রূপান্তরের সূত্র: সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট: C/5=F-32/9

উদাহরণ: ৩৭.৩° ডিগ্রী সেলসিয়াসকে ফারেনহাইটে রূপান্তর।

আমরা জানি,C/5=F-32/9;

Or; 37.3/5= F-32/9; Or, 5F-160=335.7; Or, 5F=335.7+160; Or, F= 495.7/5; Or. F=99.14; So, F= 99.1^0

অর্থাৎ, **সেলসিয়াস স্কেলে প্রাপ্ত ৩৭.৩° ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে তা ফারেনহাইট স্কেলে ৯৯.১° ডিগ্রী ফারেনহাইট।**

মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা: মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হলো ৯৮.৬° ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৭° ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর নরমাল রেঞ্জ হলো ৯৭.০° থেকে ৯৯.০° ডিগ্রী ফারনহাইট কিংবা ৩৬.১° থেকে ৩৭.২° ডিগ্রি সেলসিয়াস। শরীরের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় তখন তাকে জ্বর বা পাইরেক্সিয়া বা হাইপারথার্মিয়া বলা হয়। অর্থাৎ জ্বর হলে দেহের তাপমাত্রা ৯৯.০° ^{0}F এর অধিক নির্দেশ করে। আবার যদি শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়,তখন তাকে হাইপোথার্মিয়া বলা হয়।

তাপমাত্রা পরিমাপের উপায়: ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা পরিমাপের সাধারণত চারটি উপায় রয়েছে। যথা:

১. এক্সিলারি মেথড (বগলের নিচে)
২. ওরাল মেথড (মুখে)
৩. টিম্প্যানিক মেথড (কানে) ও
৪. রেকটাল মেথড (মলদ্বারে বা পায়ুপথে)।

ক্লিনিক্যাল ও ডিজিটাল থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতি:

- প্রথমেই সাবান ও পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং গ্লাভস পরিধান করতে হবে।
- তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একটি ট্রেতে সাজিয়ে নিতে হবে।
- ডিজিটাল অথবা গ্লাস থার্মোমিটারটি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
- রোগী যদি বসতে পারে তাহলে সোজা করে বসিয়ে নিতে হবে অথবা সুবিধাজনকভাবে অন্য কোনো অবস্থানে রাখতে হবে।
- রোগীকে তার মুখ খুলতে এবং জিহ্বা উঁচু করার জন্য বলতে হবে। রোগী যদি যোগাযোগ বা কোনো সহযোগীতা করতে না পারে তাহলে বিকল্প পন্থায় তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে,যেমন: এক্সিলারি বা রেকটাল তাপমাত্রা।
- গ্লাস বা মার্কারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সাবধানে ঝাঁকিয়ে ৩৫° ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে নিয়ে রোগীর জিহ্বার নীচে অর্থাৎ জিভের গোড়ায় ডান বা বাম দিকে আস্তে করে রাখতে হবে। রোগীকে ঠোঁট বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে রোগী যেন থার্মোমিটারটি দাঁত দিয়ে কামড় না দেয়। যদি ডিজিটাল থার্মোমিটার হয় তাহলে স্টার্ট বাটন পুশ করতে হবে। এক্সিলারি তাপমাত্রা দেখার ক্ষেত্রে এক্সিলাতে এবং রেকটাল তাপমাত্রা দেখার ক্ষেত্রে রেকটাল থার্মোমিটার মলধারে প্রবেশ করাতে হবে। পায়ুপথে তাপমাত্রা পরিমাপের সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ১ ইঞ্চি এবং বড়দের ক্ষেত্রে ১.৫ ইঞ্চি থার্মোমিটার পায়ুপথে প্রবেশ করাতে হবে। এক্ষেত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ

করানোর সময় কখনোই জোরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না। পায়ুপথে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১° ডিগ্রি বেশি এবং এক্সিলারি তাপমাত্রা ১° ডিগ্রি কম থাকে।

- রিডিং কাউন্ট সম্পন্ন হলে ডিজিটাল থার্মোমিটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপ দেওয়ার সাথে সাথে বের করে নিয়ে আসতে হবে। তবে গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে।
- থার্মোমিটারটি হালকা গরম সাবান পানিতে ধুয়ে (কখনই অধিক গরম পানিতে নয়) জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে শুকনো করে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- গ্লাভস খুলে ফেলে তা নির্ধারিতে বর্জ্য ধারকে রেখে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে।
- টেমপারেচার চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

আবার ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে রোগীর শরীরে ইনফ্রারেড রশ্মির সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে নেয়া যায় খুব সহজেই।



চিত্র ৪.৭: মুখে ওরাল টেমপেরাচার নেয়া হচ্ছে

টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা চার্ট: টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা চার্ট হল এমন একটি চার্ট যা দেহের তাপমাত্রা নথিভুক্ত ও রেকর্ড করতে ব্যবহৃত হয়। হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কাজ করতে গেলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হয়। আবার হোম কেয়ার সেটিংসে প্রায়শই কেয়ারগিভার নিজেই এটি ছক করে বানিয়ে নিয়ে রেকর্ড করে।

তাপমাত্রার চার্ট প্রণয়ন: তাপমাত্রার চার্ট প্রণয়নে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর রাখা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তাপমাত্রার চার্টের সাধারণত দুই ধরনের তথ্য সম্বলিত অংশ থাকে। যথা: প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ।

- **প্রথম অংশঃ** চার্টের প্রথম অংশের উপরিভাগে রোগীর সাধারণ তথ্য অর্থাৎ নাম, বয়স, লিঙ্গ, মাসের নাম, বেড নম্বর এবং চার্ট নম্বর থাকে। এটি খুব সহজেই রোগীকে শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
- **দ্বিতীয় অংশ:** দ্বিতীয় অংশে কিছু সারি ও কলাম এঁকে নিতে হয়। এখানে তারিখ, দিন, সময়, তাপমাত্রা ও মন্তব্যের ঘর থাকে। এখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মনিটর করা যায়।

নিম্নে একটি টেমপারেচার চার্টের নমুনা দেওয়া হল:

রোগীর নাম:______। বয়স: ___বছর। লিঙ্গ: ____। বেড নং: __। চার্ট নং:____। সমস্যা:______ তারিখ:______।					
তারিখ	দিন	সময়	তাপমাত্রা (সেঃ)	স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	রবি	সকাল ৮.০০	৩৯.৬		
		রাত ৮.০০	৩৮		
২	সোম	সকাল ৮.০০	৩৮.৪		
		রাত ৮.০০	৩৭.১		

টেবিল ৪.২: টেম্পারেচার চার্টের নমুনা ছক

দিনে যদি ২ এর অধিক বার তাপমাত্রা দেখা হয় তাহলে প্রয়োজন মত সময় ও তাপমাত্রার কলাম বাড়িয়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যদি কোনো বিশেষ মন্তব্য থাকে তাহলে তা নির্দিষ্ট ঘরে নোট করতে হবে।

থার্মোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ

অন্যান্য মেডিকেল সরঞ্জামাদির মতই থার্মোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ একটি অবশ্য করণীয় কাজ। ব্যবহারের পর থার্মোমিটার সাবান মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে অবথা ৭০% আইসোপ্রোপ্রাইল এ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। থার্মোমিটারকে ৪২° ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ১০৮° ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি তাপমাত্রায় রাখা যাবে না। সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে এমন স্থানেও রাখা যাবে না। মার্কারী বাল্বটি সবসময় নিচের দিকে রাখতে হবে এবং থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ৯৫° ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৫° ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিচে নামিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও কাজ করার পূর্বে থার্মোমিটারটিতে কোনো প্রকার ত্রুটি আছে কিনা তা চেক করে নিতে হবে এবং কাজ করার পর নির্দিষ্ট জায়গায় পরবর্তীতে ব্যবহার উপযোগী করে সংরক্ষণ করতে হবে। বাসাবাড়িতে থার্মোমিটার অবশ্যই ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

৪.৪ নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার পরিমাপ করা

নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভাইটাল সাইনস যেগুলো একজন কেয়ারগিভার খুব সহজেই পরিমাপ করতে পারেন। অন্যান্য ভাইটাল সাইনের মতই এগুলোও রেস্টিং বা রোগীকে বিশ্রামরত অবস্থায় পরিমাপ করতে হয়।

৪.৪.১ নাড়ির গতি বা পালস রেট বা হার্টবিট

মানবদেহের হৃৎপিন্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহাভ্যন্তরে সারাক্ষণ সংকোচন-প্রসারনের মাধ্যমে স্পন্দিত হয়। হৃৎপিন্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট বিট বলা হয়। এই হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমেই হৃৎপিন্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-৯০ বা ৬০-১০০ বার হয়। এটিকে হার্ট-বিটও বলা হয়। বুকের বাম পার্শ্বে হৃৎপিন্ডের এপেক্সের উপর স্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই শব্দ শোনা যায়। আবার হাতের কব্জির রেডিয়াল আর্টারি বা রেডিয়াল ধমনিতে হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায়। এটিকে তখন পালস নামেও অভিহিত করা হয়। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের যে শব্দ শোনা যায় তাকে হার্ট সাউন্ড বলে। হৃৎস্পন্দন বা হার্ট বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কব্জির রেডিয়াল আর্টারিতে আঙ্গুলের মাধ্যমে পালপেশন করে গণনা করা যায় তখন তাকে পালস রেট বলা হয়।

হৃদপিন্ডের নিলয় সংকোচনের ফলে রক্তচাপের দারুণ রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে যাওয়ার সময় ধমনীর গায়ে যে চাপ দেয় তাকে হার্টবিট বা নাড়ির গতি বলে। পালস রেট হল হৃদপিন্ড এক মিনিটে যে পরিমাণ বিট দেয় তার সংখ্যা। এই হৃদস্পন্দন আর্টারি বা ধমনীতে পাওয়া যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের পালস রেট বেশী থাকে। আবার বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের হার্টবিট আরো বেশী হয়।

নরমাল পালস রেট: একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মিনিটে সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ বা ১০০ বার বিট দেয়।

পালস দেখার সাইট: মানবদেহে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্থানে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে সহজেই পালস রেট মাপা যায়। স্থানানুযায়ী ঐ পালসের নামকরণ করা হয়। যেমন:

১। **রেডিয়াল পাল্‌স:** বেইজ অফ থাম্ব (base of thumb) বা বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় এটি পাওয়া যায়।
২। **টেম্পোরাল পাল্‌স:** সাইড অফ ফোরহেড (side of forehead) বা কপালের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
৩। **ক্যারোটিড পাল্‌স:** সাইড অফ নেক (side of neck) বা ঘাড়ের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
৪। **ব্র্যাকিয়াল পাল্‌স:** ইনার আস্পেক্ট অফ এলবো (Inner aspect of elbow) অর্থাৎ দুই কনুইয়ের ভিতরের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
৫। **ফিমোরাল পাল্‌স:** ইনার আস্পেক্ট অফ আপার থাই (Inner aspect of upper thigh) অর্থাৎ থাইয়ের উপরে উরুর দুই সন্ধিস্থলে এটি পাওয়া যায়।

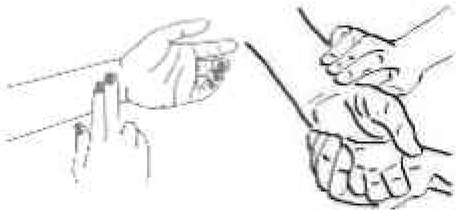
চিত্রে আরো কিছু স্থানের কথা উল্লেখ করা আছে যেখান থেকে আমরা পালপেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই নাড়ির গতি পরিমাপ করতে পারি।

পাল্‌স রেট পরিমাপ করার পদ্ধতি: উপরের চিত্রে প্রদর্শিত স্থানসমূহের যেকোনটিতে পালপেশনের সাহায্যে পাল্‌স রেট পরিমাপ করা যায়। হাতের কব্জির (রিষ্ট) উপরে যে আর্টারি থাকে তাকে রেডিয়াল আর্টারি বলে। এই আর্টারি থেকেই সাধারণত পাল্‌স রেট পরিমাপ করা হয়। রেডিয়াল আর্টারি থেকে প্রাপ্ত পাল্‌স কে রেডিয়াল পাল্‌স বলা হয়ে থাকে। নিচে রেডিয়াল পাল্‌স পরিমাপ করার ধারাবাহিক পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

- রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে রাখতে হবে, অন্যাথায় ভূল পরিমাপ আসতে পারে।
- রোগীর কব্জির হাড় এবং কব্জির বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় টেন্ডনের মধ্যে রেডীয়াল পাল্‌স অনুভব করতে হাতের দুইটি বা তিনটি আঙ্গুলের সাহায্যে আলতো চাপ ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে তর্জনী, মধ্যমা এবং তৃতীয় আঙ্গুলের ডগা ব্যবহার করতে হবে। রেডিয়াল পালস উভয় কব্জিতে নেওয়া যেতে পারে।
- এমনভাবে পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে প্রতিটি বীট অনুভব করা যায়। খুব জোরে চাপ দিলে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে পাল্‌স ঠিকমত নাও অনুভব হতে পারে।
- এভাবে নিয়ন্ত্রিত চাপ প্রয়োগ করে ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে এক মিনিট পর্যন্ত নাড়ির স্পন্দন গণনা করতে হবে। এই এক মিনিটে প্রাপ্ত ফলাফলই হচ্ছে নাড়ির গতি।
- এবার পালস রেট রেকর্ড করতে হবে।

আবার পাল্‌স অক্সিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই পাল্‌স রেটের পাশাপাশি অক্সিজেন স্যাচুরেশন, ডিজিটাল মেশিনে মাপা যায়। রক্তে অক্সিজেনের শতকরা মাত্রাকেই মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় অক্সিজেন স্যাচুরেশন। একজন সুস্থ ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা থাকা উচিৎ ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ। অক্সিজেন ৯০ এর নিচে

নেমে গেলেই সমস্যা শুরু হয়। মাত্রা বেশি কমে গেলে রোগীকে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে হয়। পাল্‌স অক্সিমিটারের সাহায্যে পাল্‌স ও অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার জন্য রোগীর আঙ্গুলে চিত্রের ন্যায় ডিজিটাল মেশিনটি লাগিয়ে দিতে হয়। তারপর সুইচ টিপে সেটি চালু করলে ১ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসপ্লেতে পাল্‌স রেট ও অক্সিজেনের মাত্রা চলে আসে।



চিত্র ৪.৭: দুই ও তিন আঙ্গুলের সাহায্যে পাল্‌স রেট মাপার পদ্ধতি

৪.৪.২ শ্বাস প্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট (Respiratory Rate)

শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট হল একজন ব্যক্তির প্রতি মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা। কোনো ব্যক্তিকে বিশ্রামরত অবস্থায় রেখে এটি পরিমাপ করতে হয়। আমরা ফুসফুসে অক্সিজেন নেয়ার জন্য শ্বসনযন্ত্রের মাধ্যমে বাতাস নেই, এটিকে নিঃশ্বাস বা শ্বাস বলে আবার যখন কার্বনডাইঅক্সাইড যুক্ত বাতাস বের করে দেই, সেটিকে বলে প্রশ্বাস। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে বুক কতবার ওঠা-নামা করে তা গণনা করে পরিমাপ করা হয়। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির বিশ্রামরত অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের হার হল মিনিটে ১২ থেকে ২০ টি। কোনো ব্যক্তির এটি যদি ১২ থেকে ২০ এর মধ্যেই থাকে তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছেন বলা যায়, যেটিকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় ইউপনিয়া (Eupnea)। আবার এটি ১২ এর কম হলে তাকে বলা হয় ব্র্যাডিপনিয়া (Bradypnea) এবং ২৫ এর বেশি হলে তাকে বলা হয় ট্যাকিপনিয়া (Tachypnea)। ব্র্যাডিপনিয়া ও ট্যাকিপনিয়া অস্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নির্দেশ করে এবং এর দ্বারা অন্য কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যার উপস্থিতি বোঝা যায়। ব্র্যাডিপনিয়া ও ট্যাকিপনিয়ার কিছু উপসর্গ আছে যেগুলো দেখে এগুলোকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। যেমন:

ব্র্যাডিপনিয়া	ট্যাকিপনিয়া
• ডিজিনেস • শরীর দুর্বল অনুভূত হওয়া • মুর্ছা যাওয়া • বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়া • ঘন ঘন শ্বাস নেয়া • স্মৃতি কমে যাওয়া • বিভ্রান্তি • অলসতা ও ঘুমের সমস্যা • বমি বমি ভাব ও বমি প্রভৃতি।	• নিশ্বাসের দুর্বলতা • শ্বাস নেয়ার সময় বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া • বুকের ব্যথার অবনতি হওয়া • সায়ানোসিস হয়। অর্থাৎ, অক্সিজেনের অভাবে ত্বক ও ঠোঁটের রঙ নীল বর্ণ ধারণ করে • পাল্‌স রেট বেড়ে যায় • বিভ্রান্তি ও • মাথা ঘোরা বা ডিজিনেস প্রভৃতি।

আবার বয়স ভেদে শ্বাস প্রশ্বাসের হার বিভিন্ন হয়। যেমন:

বয়স	শ্বাস প্রশ্বাসের হার (প্রতি মিনিটে)
নবজাতক	৩০-৬০ ব্রেদ/মিনিট
ইনফ্যান্ট	২৫-৪০ ব্রেদ/মিনিট
টডলার	২০-৩০ ব্রেদ/মিনিট
চাইল্ড	২০-২৫ ব্রেদ/মিনিট
এডোলেসেন্ট	১৫-২০ ব্রেদ/মিনিট
প্রাপ্তবয়স্ক	১২-২০ ব্রেদ/মিনিট

টেবিল : বয়স ভেদে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার

শ্বাস প্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট পরিমাপের পদ্ধতি:

- রোগীকে বসিয়ে এবং বিশ্রামরত অবস্থায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- চেয়ারে বা বিছানায় আরামদায়কভাবে বসিয়ে বা শুইয়ে নিলে ভালো হয়।
- এক মিনিটের ব্যবধানে বুক বা পেট যে পরিমাণ ওঠা-নামা করে তার সংখ্যা গণনা করে শ্বাস প্রশ্বাসের হার পরিমাপ করে নিতে হবে।
- তারপর, তা রেকর্ড শীটে নোট করতে হবে।



চিত্র ৪.৮: রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার পরিমাপের পদ্ধতি।

৪.৫ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার পরিমাপ করা:

৪.৫.১ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার কি?

হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়ে সমগ্র শরীরে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে যে পার্শ্বচাপ বা প্রেসার উৎপন্ন করে তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বোঝানো হয়। এটি মানবদেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেহকোষে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত হয়। রক্তচাপ হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা, রক্তের ঘনত্ব ও পরিমাপের উপর নির্ভর করে। আমরা ইতোমধ্যেই হৃৎপিন্ডের

ঘটন সম্পর্কে জেনেছি। হৃৎপিন্ডের স্বতস্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (Systole) এবং স্বতস্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (Diastole) বলে। অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয় তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। নিলয়ের সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। সিস্টোলিক চাপ ওপরে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ নিচে লিখে রক্তচাপ প্রকাশ করা হয়। যেমন, ১২০/৮০ মি.মি. পারদ চাপ (mmHgP) বলতে বোঝায় সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ মি.মি. পারদ চাপ। এটি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের আদর্শ রক্তচাপ। স্বাভাবিক ও সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপের পাল্লা পারদস্তম্ভের ১১০-১৪০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০-৯০ মিলিমিটার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্ব বাহুর ব্র্যাকিয়াল ধমনিতে নির্দিষ্ট উপায়ে রক্তচাপ পরিমাপ করা যায়। এছাড়াও শরীরের আরো কিছু স্থানে রক্তচাপ মাপা যায়। স্ফিগমোমেনোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

শ্রেণি বিভাগ	সিস্টোলিক	ডায়াস্টোলিক
সাধারণ	১২০	৮০
উচ্চ রক্তচাপের পূর্বাবস্থা (প্রি-হাইপারটেনশেন)	১২০-১৩৯	৮০-৮৯
উচ্চ রক্তচাপ পর্যায় ১	১৪০-১৫৯	৯০-৯৯
উচ্চ রক্তচাপ পর্যায় ২	১৬০ বা তার বেশি	১০০ বা তার বেশি
মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস)	১৮০ বা তার বেশি	১১০ বা তার বেশি

টেবিল : রক্তচাপের সারণী

৪.৫.২ উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ: হাইপারটেনশনের আরেক নাম উচ্চ রক্তচাপ, যাকে HTN দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তির রক্তের চাপ সব সময়েই স্বাভাবিকের চেয়ে উর্ধ্বে থাকে, তখন ধরে নেওয়া হয় তিনি হাইপারটেনশনে ভুগছেন। কারো রক্তচাপ যদি উভয় বাহুতে ১৪০/৯০ মি.মি. বা তার ওপরে থাকে, তাহলে তার উচ্চ রক্তচাপ হয়েছে বলা যেতে পারে।

ঝুঁকি: শরীরের অন্যান্য অঙ্গের উপর স্বল্প থেকে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এই উচ্চ রক্তচাপ। বিশেষত স্ট্রোক, হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, চোখের ক্ষতি এবং বৃক্ক বা কিডনির বিকলতা ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

কারণ: অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অতিরিক্ত মেদ, কাজের চাপ বা টেনশন, মদ্যপান, অতিরিক্ত আওয়াজ, বদ্ধ পরিবেশ ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। আবার এটি বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত একটি অসুখও। তবে ধারণা করা হয়, প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার কারণ হিসেবে লবণের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়।

করণীয়: চিকিৎসকরা মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের রক্তচাপের জন্য ওজন কমানো, ধূমপান ছেড়ে দেওয়া এবং নিয়মিত হালকা ব্যায়ামকে চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে ধরেন। যদিও ধূমপান ছেড়ে দেওয়ায় সরাসরি রক্তচাপ কমে না; কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত, কারণ এটি ছেড়ে দিলে উচ্চ রক্তচাপের বেশ কিছু উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আসে। যেমন স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাক। মৃদু উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। ফল, শাকসবজি, স্নেহবিহীন দুগ্ধজাত খাদ্য এবং নিম্নমাত্রার লবণ ও তেলজাতীয় খাদ্য উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া পরিবেশগত চাপ যেমন উঁচু মাত্রার শব্দের পরিবেশ বা অতিরিক্ত আলো পরিহার করাও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপকারী। এর পরও যাঁরা

মাঝারি থেকে উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের রক্তচাপ নিরাপদ মাত্রায় নিয়ে আসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

নিম্ন রক্তচাপ: নিম্ন রক্তচাপ বা Low Blood Pressure শব্দটা বেশ প্রচলিত। মেডিকেল পরিভাষায় নিম্ন রক্তচাপ হলো দেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের এমন একটি অবস্থা, যেখানে রক্তের সিস্টোলিক চাপ ৯০ মি.মি. পারদের নিচে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০ মি.মি. পারদের নিচে থাকে।

কারণ: দেহে রক্তের পরিমাণ কমে যাওয়া, রক্তস্বল্পতা, হরমোনের পরিবর্তন, রক্তগাত্রের প্রশস্ততা বেড়ে যাওয়া, ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, হৃৎপিণ্ড কিংবা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সমস্যা, ঠিকমতো বা সময়মতো না খেলে নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। এ ছাড়া রক্তপাত, অপর্যাপ্ত তরল গ্রহণ যেমন অনশন কিংবা অতিরিক্ত ফ্লুইড বের হয়ে যাওয়া; যেমন বমি কিংবা ডায়রিয়ার কারণেও নিম্ন রক্তচাপ হয়।

ঝুঁকি: যাদের রক্তচাপ অস্বাভাবিক হারে কম, তাদের হৃদক্রিয়া, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কিংবা মস্তিষ্কজাত সমস্যা থাকতে পারে। এই রক্তচাপ বজায় থাকলে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে রক্ত সরবরাহ কম থাকার কারণে সেখানে অক্সিজেন ও পুষ্টির অভাব হতে পারে, যা জীবনের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।

করণীয়: আলু, ডিম, মাছ, মাংস, ছানা, বাদাম, সবুজ শাক ইত্যাদি এবং লবণযুক্ত খাবার গ্রহণ, খাদ্যে কিছু ইলেকট্রোলাইট (গ্লুকোজ ও স্যালাইন) যোগ, সকালে ক্যাফেইন গ্রহণ সহায়ক হতে পারে। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সুস্থতার জন্য রক্তচাপকে নিরাপদ মাত্রার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। তাই নিয়মিত রক্তচাপ মাপা সবার জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিচের সতর্কতামূলক নিয়মগুলো পালন করলে উপকার পাওয়া যায়:

১। ডায়াবেটিস থাকলে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা;
২। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা;
৩। চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করা, যেমন: ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি ইত্যাদি।
৪। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা;
৫। পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা;
৬। নিয়মিত ব্যায়াম করা;
৭। ধূমপান থেকে বিরত থাকা;
৮। দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমান;
৯। মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা;
১০। খাবারে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা;

৪.৫.৩ রক্তচাপ পরিমাপের পদ্ধতি

অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকে। রক্তচাপ মাপার জন্য স্ফিগমোমেনোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি মূলত তিন প্রকারের হতে পারে:

ক. এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটার
খ. পারদ স্ফিগমোমেনোমিটার ও
গ. ডিজিটাল স্ফিগমোমেনোমিটার।

এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের সাহায্যে রক্তচাপ পরিমাপের জন্য স্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যার সহায়তায় শব্দের মাধ্যমে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ নির্ধারণ করা হয়। ডিজিটাল থার্মোমিটার সরাসরি রক্তচাপ পরিমাপ করে একটি ডিজিটাল স্ক্রিনে ফলাফল প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে পারদ স্ফিগমোমেনোমিটারে ফলাফলটি প্রদর্শিত হয় একটি পারদ মিটারে।



চিত্র ৪.৯: বিভিন্ন ধরনের স্ফিগমোমেনোমিটার

তবে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা অন্যান্য সেবাদানকেন্দ্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। নিচে একটি আদর্শ এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

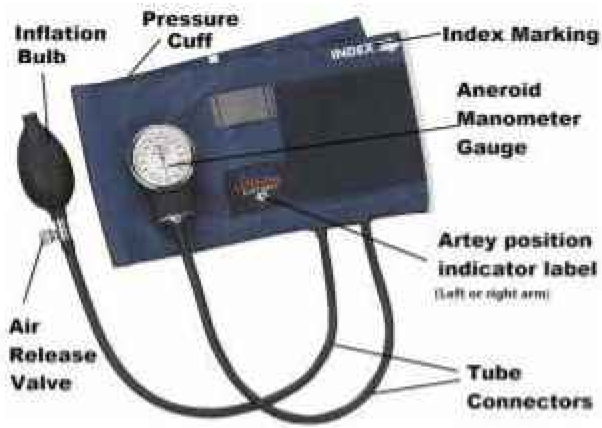
১। **বিপি বা ব্লাড প্রেসার কাফ (BP Cuff or Blood Pressure Cuff):** এটি একটি ইনফ্ল্যাটেবল ব্যাগ যা ধমনীকে আটকানোর জন্য হাতকে সংকুচিত করতে ব্যবহৃত হয়। সঠিকভাবে ব্র্যাকিয়াল আর্টারিকে নির্ধারণ করার জন্য রোগীর বয়স ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী সঠিক মাপের বিপি কাফ ব্যবহার করতে হয়। বয়স্ক ও শিশুদের জন্য পৃথক বিপি কাফ ব্যবহার করতে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর জন্য বাহুর আকারের উপর নির্ভর করে ১২*২২ সে.মি. থেকে শুরু করে ১৬*৪২ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। আবার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি ৪*৮ থেকে ৯*১৮ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে।

২। **ইনফ্লেশন বাল্ব (Inflation Bulb):** এয়ার রিলিজ বাল্ব বন্ধ রেখে ইনফ্লেশন বাল্ব হাত দিয়ে চেপে চেপে বিপি কাফের ভিতরে প্রয়োজন অনুযায়ী বাতাস প্রবেশ করানো যায়।

৩। **এয়ার রিলিজ বাল্ব (Air Release Bulb):** এয়ার রিলিজ বাল্বের মাধ্যমে বিপি কাফের ভিতরে বাতাসের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। **এনারয়েড ম্যানোমিটার (Anaroid Manometer):** এটি একটি চাপ পরিমাপক যন্ত্র যেটি মি.মি. পারদ চাপ এককে রক্ত চাপ পরিমাপ করে।

৫। **টিউব কানেক্টর (Tube Connector):** টিউব কানেকটরের সাহায্যে এনারয়েড ম্যানোমিটার ও ইনফ্লেশন বাল্ব বিপি কাফের সাথে সংযুক্ত হয়। এর মাধ্যমে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে ও বাহিরে যায় আবার চাপের কারণে ম্যানোমিটারের কাটা উঠা-নামা করা যায়



চিত্র ৪.১০: এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বিভিন্ন অংশ

স্টেথোস্কোপ (Stethoscope): স্টেথোস্কোপ হলো মানুষ অথবা প্রাণিদেহের হৃদস্পন্দন কিংবা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনার জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। এটি প্রধানত হৃদস্পন্দন এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে ব্যবহার করা হয়। তবে এটি অন্ত্র, ধমনী এবং শিরার রক্ত বয়ে চলার শব্দ শোনার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদ: স্টেথোস্কোপ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. একোয়াস্টিক স্টেথোস্কোপ **(Acuoustic Stethoscope):** আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা সচরাচর এই ধরনের স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেন। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির একুয়াস্টিক থার্মোমিটার পাওয়া যায়।

২. **ইলেকট্রনিক স্টেথোস্কোপ (Electronic Stethoscope):** এ ধরনের স্টেথোস্কোপ শব্দতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করে সেটিকে অ্যাম্প্লিফাই করে জোরালো ও পরিষ্কার শব্দে পরিণত করে।

৩. **নয়েজ রিডাকশন স্টেথোস্কোপ** (Noise Reduction Stethoscope): এধরনের স্টেথোস্কোপ চারপাশের অপ্রয়োজনীয় নয়েজ বাদ দিয়ে কেবল কাংখিত শব্দ শুনতে সাহায্য করে।

৪. **রেকর্ডিং স্টেথোস্কোপ (Recording Stethoscope):** এর সাহায্যে শ্রুত শব্দকে রেকর্ড করে এবং পরবর্তীতে ধারনকৃত শব্দ বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

৫. **ফেটাল স্টেথোস্কোপ (Fetal Stethoscope):** গর্ভাবস্থায় ভ্রুনের হৃদস্পন্দন শুনতে এ ধরনে স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

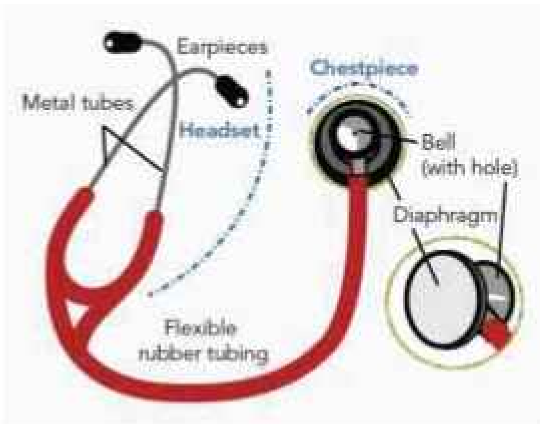
স্টেথোস্কোপের নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও চিকিৎসকেরা মূলত: রোগ নির্ণয়ের কাজেই এটি ব্যবহার করেন। রোগীর Clinical Examination এর চারটি ধাপের মধ্যে একটি হচ্ছে অসকালটেশন (Auscultation), যা স্টেথোস্কোপের সাহায্য ছাড়া প্রায় অসম্ভব। নিচে একটি স্টেথিস্কোপের বিভিন্ন অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১। **ইয়ারপিস (earpiece):** এই অংশটি কানের মধ্যে প্রবেশ করানোর পর ডায়াফ্রাম চালু থাকলে শরীরের অভ্যন্তরীণ শব্দসমূহ শোনা যায়।

২। **টিউবিং:** এটি একটি নমনীয় রাবার টিউব যেট ডায়াফ্রাম দ্বারা গৃহীত শব্দ ইয়ারপিসের মাধ্যমে আমাদের শ্রবণযন্ত্রে পৌঁছে দেয়।

৩। **বেল:** বেল বা ঘণ্টা ডায়াফ্রামের উল্টো পাশে লাগানো থাকে এবং এটি মৃদু ও অমসৃন শব্দ শুনতে সাহায্য করে। এটিকে ঘুরিয়ে ডায়াফ্রামের মুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়।

৪। ডায়াফ্রাম: ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা স্টেথোস্কোপের এমন একটি সমতল অংশ যেটি রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করাতে হয়। এটিই মূলত শব্দ গ্রহণ করে টিউবের মাধ্যমে আমাদের কানে পৌঁছে দেয়।



চিত্র ৪.১১: স্টেথোস্কোপের বিভিন্ন অংশ

রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি:

১। সঠিক নিয়মে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে।

২। স্টেথোস্কোপের এয়ার পিস ও ডায়াফ্রাম জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

৩। ব্লাড প্রেসার মনিটর ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৪। রোগীকে আরামদায়কভাবে বসিয়ে অথবা শুইয়ে নিতে হবে।

৫। রক্তচাপ মাপার জন্য চাপবিহীন অবস্থায় বিপি কাফের নিচের প্রান্ত কনুইয়ের সামনের ভাঁজের ২.৫ সেঃ মি. উপরে ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হবে।

৬। কনুইয়ের সামনে হাত দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীর অবস্থান স্থির করে তার উপর স্টেথো স্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে নিতে হবে।

৭। ডায়াফ্রামটি এমনভাবে আলতো করে চাপ দিতে হবে যেন ডায়াফ্রাম এবং ত্বকের মাঝখানে কোনো ফাকা না থাকে।

৮। চাপ মাপার সময় স্টেথোস্কোপ কিংবা কাফের ওপরে হাত না রেখে কাজ করতে হবে।

৯। ব্যারোমিটারের ঘড়ি হৃদপিণ্ডের সাথে একই তলে অবস্থান করিয়ে নিতে হবে।

১০। এরপর রেডিয়াল ধমনী অনুভব করে ধীরে ধীরে ইনফ্লেশন বাল্বের সাহায্যে বিপি কাফটি ফুলিয়ে চাপ বাড়াতে হবে।

১১। রেডিয়াল পালস বন্ধ হওয়ার পর ব্যারোমিটারে চাপ ৩০ মি. মি. উপরে নিতে হবে।

১২। তারপর আস্তে আস্তে চাপ কমাতে হবে। প্রতি বিটে সাধারণত ২ মি. মি. চাপ কমানো যেতে পারে।

১৩। এবার চাপ কমানোর সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীতে সৃষ্ট শব্দ মনোযোগের সঙ্গে শুনো। চাপ কমতে শুরু করলে রক্ত চলাচলের ফলে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়। একে করটকফ শব্দ (Korotkoff sound) বলা হয়। করটকফ শব্দ ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়।

১৪। প্রথমে এক ধরনের যে তীক্ষ্ণ শব্দে পাওয়া যায় এটাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে ধরতে হবে।

১৫। করটকফ শব্দের তীক্ষ্ণতা ধীরে ধীরে কমে আসতে আসতে এক সময় প্রথম পর্যায়ের শব্দ থেমে যায়। এই শব্দ বন্ধ হওয়ার আগে যে শব্দ শোনা যায় সেটাকেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে ধরতে হবে।
১৬। বিপি মেশিন খুলে ফেলে পরিমাপ করা ব্লাড প্রেসার রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কাজ শেষে বিপি ইন্সট্রুমেন্ট নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে এবং কোনো অসুবিধা থাকলে চিকিৎসক বা নার্সকে অবহিত করতে হবে।



চিত্র ৪.১২: এনারয়েড ও ডিজিটাল মেশিনে রক্তচাপ মাপা হচ্ছে

৪.৬ মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করা

৪.৬.১ উচ্চতা ও ওজন:

সেবাগ্রহী ব্যক্তির উচ্চতা ও ওজন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো অন্যান্য ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণগুলোর সাথে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেকোনো কাজের শুরুতেই মেপে নিয়ে রেকর্ড করতে হয়। স্বাস্থ্যের ভালোমন্দের অনেকখানিই নির্ভর করে উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী শারীরিক ভারসাম্যের উপর। ওজন বেশি হলে শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেহে বাসা বাধে নানা রোগ। তাই উচ্চতার সাথে ভারসাম্য রেখে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। এজন্য অসুস্থ রোগী ছাড়া সুস্থ ব্যক্তির জন্যও নিয়মিত ওজন মাপা এবং উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন বজায় রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করার উপায়: উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করে একজন মানুষের স্বাস্থ্যমান জানা যায়। তার বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজনে কোন তারতম্য আছে কিনা তা অবগত হওয়া যায়। বিশেষ করে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস খুব সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চতা ও ওজন হলো স্বাস্থ্য ঝুঁকির একটি মূল নির্দেশক। ওজনকে সাধারণত পাউন্ড অথবা কিলোগ্রাম হিসেবে লেখা হয় এবং উচ্চতাকে মিটার/সেন্টিমিটার/ইঞ্চিতে লেখা হয়। ওজন পরিমাপের জন্য ওজন পরিমাপক যন্ত্র পাওয়া যায়। ওজন পরিমাপক যন্ত্র মূলত দু'রকমের, যথা: এনালগ ও ডিজিটাল। কিছু নিয়ম মেনে এই মেশিনের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ালে মিটার বা ডিসপ্লে পর্দা দেখে সহজেই ওজন দেখা যায়। তবে বাসা কিংবা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যেখানেই হউক না কেন ওজন মাপার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় নজর দেওয়া উচিৎ, যেমন:

যন্ত্রটি কার্পেট, ম্যাট বা মেঝেতে সমান জায়গায় রাখতে হবে। সেবাগ্রহীতাকে ভারী জামাকাপড় পরিহার করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। মুঠোফোন, মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ফাইল বা অন্য যেকোনো ব্যক্তিগত সরঞ্জাম যা সঠিক ওজনের তারতম্য সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো অন্যত্র রেখে মেশিনের উপর দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। জুতা না পরে ওজন মাপা শ্রেয়। পেট ভরে খেয়েই বা অনেক পানি বা তরল পান করার পরপর ওজন মাপা উচিৎ নয়। ব্যায়ামের পরপরও ওজন

মাপবেন না। নারীদের ক্ষেত্রে পিরিয়ড বা মাসিকের সময় বাদ দিয়ে ওজন মাপতে বলা উচিৎ। যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁরা ওজন মেপে একটা চার্ট তৈরি করুন।

অনেক যন্ত্র পাউন্ডে ওজন দেখায়। পাউন্ডকে কিলোগ্রামে রূপান্তর করতে প্রাপ্ত ওজনকে ০.৪৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। ওজন পরিমাপের পর তার চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে। আবার উচ্চতা মাপার জন্য দরকার হয় একটি উচ্চতা পরিমাপক ফিতা বা উল্লম্ব স্ট্যান্ডের যেখানে মিটার বা সেন্টিমটার বা উভয় স্কেলে দাগ কাটা থাকে। উচ্চতা মাপার জন্য সোজা হয়ে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে হয়। ফুট এবং ইঞ্চিতেও উচ্চতা মাপা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিটার স্কেলে উচ্চতার মান আমাদের জানতে হয়। যেমন শরীরের বিএমআই মাপার ক্ষেত্রে। তবে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির সেন্সর সম্বলিত মেশিন পাওয়া যায় যেগুলো নিমিষেই শরীরের ওজন, উচ্চতা, বিএমআই প্রভৃতি পরিমাপ করতে পারে সঠিকভাবে।



চিত্র ৪.১৩: মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ

৪.৬.২ বিএমআই বা বডি ম্যাস ইনডেক্স (BMI or Body Mass Index)

মানব শিশু জন্মানোর পর থেকেই দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে যা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির ২০-২৪ বছরের পর সাধারণত দৈহিক উচ্চতার তেমন একটা বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয় না। তখন খাদ্যের কাজ হয় শুধুমাত্র দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখা। প্রাপ্তবয়সে সুস্বাস্থের জন্য দেহের উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের একটি সামঞ্জস্য প্রয়োজন হয়। দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সূচককেই বিএমআই বা বডি ম্যাস ইনডেক্স বা ভরসূচি বলা হয়। উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের সামঞ্জস্য থাকলে একজন ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যায়। আবার যদি শরীরের ওজন ভরসূচি অনুযায়ী নির্দেশিত বা প্রাপ্ত ওজনের চেয়ে খুব বেশি কমবেশি হয়ে পড়ে তখন নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিএমআই মাপার সূত্র হচ্ছে: *দেহের ওজন (কেজি)/ {দেহের উচ্চতা (মিটার)}* ^{2}

অর্থাৎ কিলোগ্রাম এককে কোনো ব্যক্তির দেহের ওজন পরিমাপ করে সেটিকে মিটার এককে পরিমিত উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে সেই ব্যক্তির বিএমআই বা ভরসূচি পাওয়া যায়। উদাহরণ: ধরা যাক একজন ব্যক্তির দেহের ওজন ৭২ কেজি এবং উচ্চতা ১.৭৮ মিটার। তাহলে তার বিএমআই= ৮০/(১.৭৮*১.৭৮)= ২৫.২৫ (প্রায়)। যেকোনো বয়সের নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে বিএমআই এর স্বাভাবিক পাল্লা বা রেঞ্জ হচ্ছে

১৮.৫ থেকে ২৪.৯। বিমএমআই মান যদি ১৮.৫০ এর চেয়ে কম হয় তাহলে বলা যায় ব্যক্তিটি ওজন স্বল্পতায় ভুগছে। আবার যদি বিএমআই এর মান ২৫ থেকে ২৯.৯ পর্যন্ত হয়, তাহলে ব্যক্তিটি ওজনাধিক্যে ভুগছে। বিএমআই এর মান ৩০ থেকে ৩৯.৯ হলে স্থুল এবং ৪০ এর অধিক হলে অতিরিক্ত স্থুল বলা হয়ে থাকে।



চিত্র ৪.১৪: বডি ম্যাস ইনডেক্স

কোনো ব্যক্তির এরকম স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি বিএমআই পাওয়া গেলে তাকে জীবন যাত্রার ধরন যেমন: খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও বিশ্রাম ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে শরীরের ওজন আদর্শ বিএমআই নির্দেশিত ওজনের চেয়ে কম বা বেশি না হয়ে যায়। নিম্নে নির্দিষ্ট উচ্চতা অনুযায়ী নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে আদর্শ ওজন কত হওয়া উচিৎ তার একটি চার্ট প্রদান করা হলো:

উচ্চতা	পুরুষ (কেজি)	নারী (কেজি)
৪ ফুট ১০ ইঞ্চি	৪৪-৫৪	৪১-৫২
৫ ফুট	৪৭-৫৮	৪৩-৫৫
৫ ফুট ৪ ইঞ্চি	৫৩-৬৬	৪৯-৬৩
৫ ফুট ৬ ইঞ্চি	৫৬-৭০	৫৩-৬৭
৫ ফুট ৮ ইঞ্চি	৬০-৭৪	৫৬-৭১
৫ ফুট ১০ ইঞ্চি	৬৪-৭৯	৫৯-৭৫
৬ ফুট	৬৭-৮৩	৬৩-৮০

টেবিল ৪.৫: উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন

জব: ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণসমূহ পরিমাপ করা

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস , ইকুইপমেন্ট , মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি ।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুল্‌স, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): স্টেথোস্কোপ, ব্লাড প্রেসার মেশিন (এ্যানালগ এবং ডিজিটাল), ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (এ্যানালগ এবং ডিজিটাল), স্টপ ওয়াচ, ওজন পরিমাপক যন্ত্র, মেজারিং টেপ বা উচ্চতা মাপক যন্ত্র, ময়লা ফেলার বিন, জার উইথ স্যাভলন অথবা এ্যালকোহল, কিডনী ট্রে ইত্যাদি।

জব ১ (ক): ওজন পরিমাপ করা

ধাপ-১। পরিমাপ করার আগে ওজন মেশিনটি কাজ করে কিনা বা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

ধাপ-২। রোগী মেশিনে ওঠার আগে ওজন স্কেল জিরো বা নিউট্রাল করে নিতে হবে।

ধাপ-৩।পকেটে কোনো ভারী বস্তু যেমন চাবি, মোবাইল, ওয়ালেট থাকলে তা বের করে রাখুন।

ধাপ-৪। পায়ের জুতা, ভারী জ্যাকেট বা সোয়েটার থাকলে তা খুলে রাখুন।

ধাপ-৫। ওজন মাপার সময় রোগীকে শরীর সোজাসুজি রেখে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন।

ধাপ-৬। মেজারিং স্কেল অথবা ডিজিটাল স্ক্রিন স্থির হলে ওজনটি দেখুন ও তা চার্টে রেকর্ড কর।

জব ১ (খ): উচ্চতা পরিমাপ করার পদ্ধতি

ধাপ-১। উচ্চতা মাপার আগে উচ্চতা মাপক স্কেল অথবা মেশিনটি ঠিক আছে কিনা তা চেক ও কেলিব্রেটেড করে নিন

ধাপ-২। তারপর রোগীকে তার জুতা খুলতে বলুন।

ধাপ-৩।রোগীকে পিছন দিকে ফিরিয়ে ওয়ালের সাথে তার পিঠ ঠেকিয়ে নিন।

ধাপ-৪। রোগীর সন্মুখভাগ সামনা সামনি বরারর রেখে সোজা হয়ে দাড়াতে বলুন।

ধাপ-৫। এবার ভালো করে খেয়াল করে দেখুন যেন তার পায়ের গোড়ালি, পিঠ, মাথার পিছন সাইট হাইট স্কেলের ওয়ালে লেগে থাকে।

ধাপ-৬। এবার আস্তে আস্তে উচ্চতা মেশিনের সাথে লাগানো মেজারিং ডিভাইসটি একদম মাথার উপরের অংশে এডজাষ্ট করে নিন এবং আপনার আই লেভেল সোজাসুজি রেখে উচ্চতা পরিমাপ করে রেকর্ড কর।

জব ১ (গ): ওরাল মেথডে তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতি

ধাপ-১। প্রথমেই সাবান ও পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধৌত কর।
ধাপ-২। গ্লাভস পরিধান কর।
ধাপ-৩। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একটি ট্রেতে সাজাও।
ধাপ-৪। ডিজিটাল অথবা গ্লাস থার্মোমিটারটি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
ধাপ-৫। রোগী যদি বসতে পারে তাহলে সোজা করে বসিয়ে নাও।
ধাপ-৬। রোগীকে তার মুখ খুলতে এবং জিহ্বা তুলতে বল।
ধাপ-৭। গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সাবধানে ঝাঁকিয়ে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে নিয়ে রোগীর জিহ্বার নীচে অর্থাৎ জিভের গোড়ায় ডান বা বাম দিকে আস্তে আস্তে রাখ।
ধাপ-৮। রোগীকে তার ঠোঁট বন্ধ করতে বল এবং খেয়াল রাখো যেন থার্মোমিটারটি দাঁত দিয়ে কামড়ে না দেয়। যদি ডিজিটাল থার্মোমিটার হয় তাহলে স্টার্ট বাটন পুশ কর।'
ধাপ-৯। রিডিং কাউন্ট সম্পন্ন হলে ডিজিটাল থার্মোমিটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপ দেওয়ার সাথে সাথে বের কর। তবে গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মিনিট অপেক্ষা কর।
ধাপ-১০। তারপর থার্মোমিটারটি বের করে তাপমাত্রা দেখ
ধাপ-১১।থার্মোমিটারটি হালকা গরম সাবান পানিতে ধৌত কর (কখনই অধিক গরম পানিতে নয়) জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে শুকনো করে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ কর।
ধাপ-১২। গ্লাভস খুলে ফেলে তা নির্ধারিতে বর্জ্য ধারকে রেখে হ্যান্ড ওয়াশ কর।
ধাপ-১৩। টেমপারেচার চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড কর।

জব ১ (ঘ): এক্সিলারী তাপমাত্রা নেওয়া।

ধাপ-১। প্রথমেই সাবান ও পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধৌত কর।
ধাপ-২। গ্লাভস পরিধান কর।
ধাপ-৩। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একটি ট্রেতে সাজাও।
ধাপ-৪। ডিজিটাল অথবা গ্লাস থার্মোমিটারটি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
ধাপ-৫। গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সাবধানে ঝাঁকিয়ে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে নিয়ে বগলের নীচে থার্মোমিটারটি স্থাপন কর।
ধাপ-৬। রোগীকে বুকের সাথে হাত শক্ত করে চেপে রাখতে বলে ডিজিটাল থার্মোমিটারটি বিপ দেওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এবং গ্লাস অথবা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তিন থেকে চার মিনিট রেখে দাও।
ধাপ-৭। নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করার পর থার্মোমিটারটি বের কর এবং সঠিক তাপমাত্রাটি দেখে নাও।
ধাপ-৮। থার্মোমিটারটি হালকা গরম সাবান পানিতে ধুয়ে (কখনই অধিক গরম পানিতে নাও)। জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে শুকনো করে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ কর।
ধাপ-৯। গ্লাভস খুলে ফেলে তা নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে রেখে হ্যান্ড ওয়াশ কর।
ধাপ-১০। টেমপারেচার চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড কর।

জব ১ (ঙ): হার্টবিট বা পালস পরিমাপ করার পদ্ধতি

ধাপ-১। প্রথমেই হ্যান্ড ওয়াশিং কর।
ধাপ-২। গ্লাভস পড়ার প্রয়োজন হলে তা পড়ে নাও।

ধাপ-৩। যে হাত দিয়ে হার্ট বিট ফিল করবে তার অন্য হাতে হাতঘড়ি পরে নিতে হবে।
ধাপ-৪। রোগীর পজিশনিং করে নাও। রোগীর হাতটি একটি টেবিলের উপরে রেষ্টিং অবস্থায় রাখ।
ধাপ-৫। ইন্ডেক্স ফিঙ্গার বা মাঝখানের তিন আংগুলের মাঝের আংগুলোটি ব্যবহার কর ও রোগীর কব্জিতে বুড়ো আংগুলের ২ ইঞ্চি নীচে নাড়ি অনুভব না করা অবধি মাঝারি চাপ প্রয়োগ কর।
ধাপ-৬। পুরো এক মিনিট ধরে পালস কাউন্ট কর অথবা ৩০ সেকেন্ড কাউন্ট করে ২ দিয়ে গুণ কর।
ধাপ-৭। পালস রেট রেকর্ড কর।

জব ১ (চ): রক্তচাপ পরিমাপ করা

ধাপ-১। হ্যান্ড ওয়াশ কর।
ধাপ-২। স্টেথোস্কোপের এয়ার পিচ ও ডায়াফ্রাম জীবানুমুক্ত করে নাও।
ধাপ-৩। ব্লাড প্রেসার মনিটর ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা কর।
ধাপ-৪। রোগীকে বসিয়ে অথবা শুইয়ে নাও।
ধাপ-৫। রক্তচাপ মাপার জন্য চাপবিহীন অবস্থায় রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ-এর নিচের প্রান্ত কনুইয়ের সামনের ভাঁজের ২.৫ সে. মি. উপরে ভালোভাবে আটকাও।
ধাপ-৬। কনুইয়ের সামনে হাত দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীর অবস্থান স্থির করে তার উপর স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে নাও।
ধাপ -৭। ডায়াফ্রাম এমনভাবে চাপ দাও যেন ডায়াফ্রাম এবং ত্বকের মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকে।
ধাপ-৮। চাপ মাপার সময় স্টেথোস্কোপের কাপড় কিংবা কাফের ওপরে হাত না রেখে পরবর্তী কাজ কর।
ধাপ-৯। রক্ত চাপমান যন্ত্রের ঘড়ি হৃদপিন্ডের একই তলে অবস্থান করে নাও।
ধাপ-১০। এরপর রেডিয়াল ধমনী অনুভব করে ধীরে ধীরে চাপমান যন্ত্রের চাপ বাড়াতে হবে।
ধাপ-১১। রেডিয়াল পালস বন্ধ হওয়ার পর চাপ ৩০ মি. মি. উপরে নাও।
ধাপ-১২। তারপর আস্তে আস্তে চাপ কমাও। প্রতি বিটে সাধারণত ২ মি. মি. চাপ কমানো যেতে পারে।
ধাপ-১৩। এবার চাপ কমানোর সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীতে সৃষ্ট শব্দ মনোযোগের সঙ্গে শুনো। জেনে রাখ, চাপ কমতে শুরু করলে রক্ত চলাচলের ফলে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়। একে করটকফ শব্দ (Korotkoff sound) বলা হয়। করটকফ শব্দ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়।
ধাপ-১৪। প্রথমে এক ধরনের যে তীক্ষ্ণ শব্দ পাওয়া যায় এটাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট কর।
ধাপ-১৫। করটকফ শব্দের তীক্ষ্ণতা ধীরে ধীরে কমে আসতে আসতে এক পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে করটকফ শব্দ থেমে যায়। এই শব্দ বন্ধ হওয়ার আগে যে শব্দ শোনা যায় সেটাকেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট কর।
ধাপ-১৬। বিপি মেশিন খুলে ফেলে পরিমাপ করা ব্লাড প্রেসার রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।
ধাপ-১৭। কাজ শেষে বিপি ইন্সট্রুমেন্ট নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখ।

১০৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। হেল্থ স্ক্রিনিং বলতে কি বুঝ?

২। হেল্থ স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে অনুমান করা যায় এমন চারটি রোগের নাম লিখ।

৩। হেল্থ স্ক্রিনিং-এ রক্ত ও প্রস্রাব নমুনা টেস্টের চারটি নাম উল্লেখ কর।

৪। একজন কেয়ারগিভার হেল্থ স্ক্রিনিং-এ সাধারণত কি কি বিষয়গুলো পরিমাপ করেন?

৫। রেকর্ড বইতে উচ্চতা ও ওজন কোনো এককে লেখা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিএমআই কী? একজন মানুষের বিএমআই (BMI) কিভাবে নিরূপণ করা হয়?

২. শারীরিক পরীক্ষা বা ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে মৌলিক পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. হেল্থ স্ক্রিনিং-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. ভাইটাল সাইন কী? কেয়ারগিভারের জন্য ভাইটাল সাইন পরিমাপের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বেসিক লাইফ সাপোর্ট

Basic Life Support (BLS)





বেসিক লাইফ সাপোর্ট (Basic Life support) BLS নামেও পরিচিত। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মরণাপন্ন অবস্থায় মানুষের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়, যতক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তি আরও বিস্তারিত বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ করার সুযোগ না পাচ্ছেন। এই দক্ষতাগুলো প্যারামেডিকস, নার্স এবং যারা BLS প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের থাকে; দক্ষ হাতে না করলে রোগী আরও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে যেতে পারে। আগের অধ্যায়ে আমরা বেসিক হেল্থ স্ক্রিনিং-এর প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা জানব, চিকিৎসা ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থাগুলো কী কী, ঐ অবস্থাগুলোতে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত ব্যক্তির করণীয় এবং বেসিক লাইফ সাপোর্ট বিশেষজ্ঞের করণীয় কী।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করতে পারব ।
- বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারব ।
- শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবো ও শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি প্রদর্শন করতে পারব ।
- নাড়ি পরীক্ষা করতে পারব ।
- সঠিক নিয়মে সিপিআর (কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন)- এর প্রাথমিক ধাপগুলো বর্ণনা ও প্রদর্শন করতে পারব ।
- চোকিং-ব্যবস্থাপনার জন্য ভিক্টিমের বয়স ও অবস্থা অনুযায়ী হাইমলেখ ম্যানুভার প্রদর্শন করতে পারব ।
- পুড়ে যাওয়া ও নাক দিয়ে রক্তপাত হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারব ।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা মরণাপন্ন মানুষকে প্রাথমিকভাবে সেবাদান করতে পারব । জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব ।

৫.১ বেসিক লাইফ সাপোর্ট (Basic Life Support)

যখন একজন রোগীর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় (হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়), তখন তাদের জীবন রক্ষার্থে বেসিক লাইফ সাপোর্ট (BLS) প্রদান করা যেতে পারে। মূলত এখানে হৃদপিন্ড থেকে শরীরের চারপাশে রক্ত সরবরাহ বজায় রাখতে বুকের চাপ দেওয়া হয়, যা টিস্যু ও মস্তিষ্কের অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রাখা নিশ্চিত করে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা অ্যাসফেক্সিয়া (মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব)-এর শিকার ব্যক্তিরা এমন জরুরি অবস্থার মধ্যে থাকে, যেখানে তাদের জীবন বাঁচাতে এবং তাদের স্বাস্থ্য আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য "চেইন অফ সারভাইভালো" নামক চারটি কাজের সমন্বয় প্রয়োজন হয়। এই চারটি কাজ হল (চিত্র ৫.১.ক):

১. কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট প্রতিরোধ

২. কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের অবিলম্বে সনাক্তকরণ এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা সক্রিয়করণ

৩. বেসিক লাইফ সাপোর্ট (CPR- Cardiopulmonary resuscitation and AED-Automated External defibrillator)

৪. অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট এবং পরবর্তী সেবা



চিত্র ৫.১.ক সব বয়সের জন্য চেইন অফ সারভাইভালো। প্রতিরোধ, অবিলম্বে সনাক্তকরণ ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা সক্রিয়করণ, প্রাথমিক সিপিআর এবং অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট এবং পরবর্তী সেবা

৫.১.১ বেসিক লাইফ সাপোর্ট এর গুরুত্ব (Importance of Basic Life Support)

বেসিক লাইফ সাপোর্ট (BLS) হল একটি জরুরি চিকিৎসা সেবা। যেকোনো জায়গায় একজন মরনাপন্ন ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুবই সহায়ক হতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে BLS-এর উদ্দেশ্য ব্যক্তির 'রোগমুক্তি' করা নয় বরং জরুরি চিকিৎসা সহায়তা না আসা পর্যন্ত রোগীর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে না দেওয়া। BLS পদ্ধতিটি মূলত হৃদযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রের বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির শ্বাস এবং হৃদস্পন্দন পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। তবে পরবর্তীতে রোগীকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। BLS পদ্ধতিটি সঠিক উপায়ে প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত BLS প্রশিক্ষণের উপর প্রচুর জোর দেওয়া হয়। সঠিক উপায়ে BLS প্রদান করতে ব্যর্থ হলে রোগী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পরতে পারে, তাই সঠিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই প্রশিক্ষণটি নেয়া জরুরি।

৫.১.২ বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি (Situation where BLS is needed)

সাধারণত হৃদযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রয়োজন হয়। যেমন:

- হার্ট অ্যাটাক
- করোনারি ধমনীর রোগ
- হার্ট ফেইলিউর
- হার্টের অনিয়মিত ছন্দ
- যেকোনো শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ

এছাড়া প্রয়োজন হতে পারে ইলেক্ট্রোকিউশন, প্রচুর রক্তক্ষরণ, এলার্জি প্রতিক্রিয়া, ডুবে যাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত মাদকসেবন প্রভৃতি পরিস্থিতিতে। একটি কার্ডিওপালমোনারী অ্যারেস্ট সাধারণত সতর্কতা ছাড়াই ঘটে। যদি কেউ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে থাকে, তবে সে,

- অজ্ঞান হয়ে যাবে
- প্রতিক্রিয়াহীন হবে এবং
- স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেনা

৫.১.৩ বেসিক লাইফ সাপোর্টের সময় প্রাথমিক পরিস্থিতি পরীক্ষা: (DR-AB)

ধাপ-১ পারিপার্শ্বিক বিপদচিহ্ন (Danger): আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থান ও স্থান এবং তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত কর। রোগীর আশেপাশের অবস্থা, রোগীর কোনো সংক্রমক রোগের চিহ্ন আছে কি না ইত্যাদি।

ধাপ-২ রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা (Response): সাহায্যের জন্য আশেপাশের মানুষের কাছে আবেদন কর, রোগীকে উদ্দীপিত কর**,** রোগীর কাঁধে হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকো। ১০ সেকেন্ডের জন্য এই লক্ষণগুলো আছে কি না লক্ষ্য কর:

- অজ্ঞান হওয়া
- প্রতিক্রিয়াহীনতা এবং
- শ্বাস-প্রশ্বাসহীনতা

অভিজ্ঞরা ক্যারোটিড পালস পরীক্ষা করেও দেখতে পারে, তবে এটা জরুরি অবস্থায় অত্যাবশ্যাক।



চিত্র ৫.১.খ ধাপ-২

রোগী তোমার ডাকে সাড়া দিলে তাকে তার অবস্থানে থাকতে দাও ও তার কি সমস্যা হয়েছিল তা জানার চেষ্টা কর। প্রয়োজনে সাহায্য নাও। রোগী তোমার ডাকে সাড়া না দিলে পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৩ রোগীর শ্বাসনালী (Airway):

এয়ারওয়ে ব্যবস্থাপনা মেরুদণ্ডসহ অন্য যে কোনো আঘাতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্বাসনালীতে কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করতে রোগীর মুখ খুলে দেখ এবং যদি থাকে তা বের করার জন্য মাথা একপাশে ঘুরিয়ে দাও। যদি কিছু বের না হয়, তাহলে রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখার জন্য পুনরায় পরীক্ষা কর। শ্বাসনালী পর্যবেক্ষণ করার কৌশলগুলো মনে রাখতে হবে - প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কপালে এক হাত রেখে মাথা পিছনের দিকে বা ঘাড়ের দিকে সামান্য ভাঁজ করবে ও অন্য হাত দিয়ে চিবুক সামান্য উঁচু করে ধরতে হবে, শিশুদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে হবে।



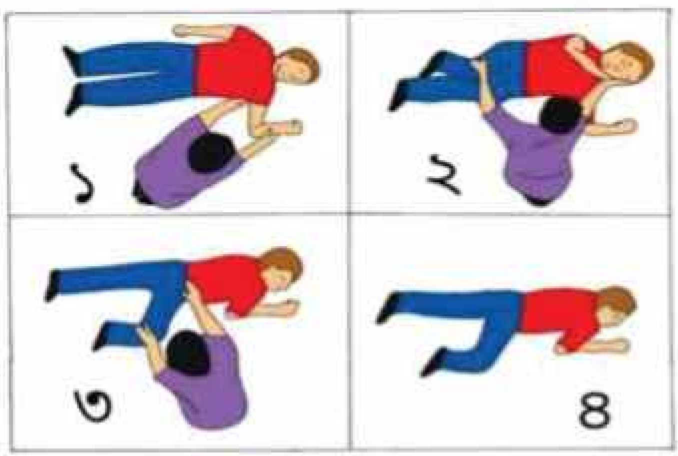
চিত্র ৫.১.গ ধাপ-৩

ধাপ-৪ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস (Breathing):

রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর, মাথা এবং চিবুকের অবস্থান বজায় রেখে এটি কর, তোমার গাল এবং কান রোগীর মুখের উপর রাখো যেন বুক পর্যবেক্ষণ করার সময় শ্বাসযন্ত্রের যে কোনোও প্রচেষ্টা অনুভব করা যায় এবং বুকের উঠানামা দেখা যায়। ১০ সেকেন্ড ধরে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস আছে কি না তা মূল্যায়ন করা উচিত। যদি রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, কিন্তু অজ্ঞান থাকে, তাহলে রোগীকে চিত্র ৫.১.ঙ এর ন্যায় পুনরুদ্ধার অবস্থানে (Recovery position) নিয়ে আসতে হবে।



চিত্র ৫.১.ঘ ধাপ-৪



চিত্র ৫.১.ঙ: পুনরুদ্ধার অবস্থানে (Recovery position) নিয়ে আসার নিয়ম

১- ব্যক্তির হাত-পা সোজা কর। তার মাথার পাশে ডান হাতটি ভাঁজ করে রাখো।

২- ব্যক্তির বাম হাতটি তার ডান গালের নীচে রাখো।

৩- ব্যক্তির বাম পা হাঁটু বরাবর ভাঁজ কর। ব্যক্তির মাথা এবং ঘাড় সতর্কতার সাথে ধরে আলতোভাবে ভাঁজ করা হাঁটুটিকে ডানদিকে নিয়ে কাত করে শোয়াও।

৪- উপরের পা সামঞ্জস্য কর, যাতে নিতম্ব এবং হাঁটু উভয়ই ডান কোণে বাকানো থাকে। নিশ্চিত কর যে,ব্যক্তিটি যেন ঘুড়ে না যায়।

যদি রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস না নেয়, তবে নিকটস্থ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা কর বা ৯৯৯ এ কল করে সাহায্যের জন্য আবেদন কর। অবিলম্বে তার উপর CPR শুরু কর।

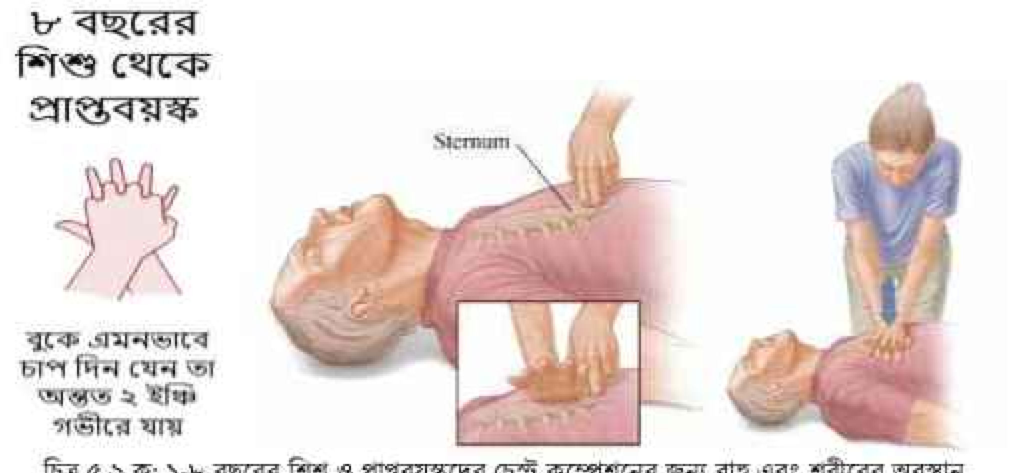
৫.২ কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন (CPR- Cardiopulomonary resuscitation)

বেসিক লাইফ সাপোর্টের সময় প্রাথমিক পরিস্থিতি পরীক্ষার পরই যেই ধাপ তা হল, কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন। কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন শুরু করার আগে তোমার বাহু ও শরীর সঠিক অবস্থানে আনতে হবে।

৫.২.১ বুকে চাপ দিয়ে সংকোচন শুরু করার জন্য বাহু এবং শরীরের অবস্থানের নিয়ম নিচে বর্ণনা করা হল:

৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য:

- ✓ তোমার দুই বাহু, কনুই ও কাঁধ সোজা কর যেন সব সমরেখায় থাকে।
- ✓ বুকের উপরে স্টার্নামের নিম্নের অংশে (চিত্র ৫.১.ক) এই অবস্থানে হাতের গোড়ালি রেখে, তার উপর আরেক হাত দিয়ে আঙ্গুলগুলো চিত্র ৫.২.ক-এর ন্যায় ইন্টারলক কর।



চিত্র ৫.২.ক: ১-৮ বছরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চেস্ট কম্প্রেশনের জন্য বাহু এবং শরীরের অবস্থান

১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

- ✓ তোমার দুই বাহু, কনুই ও কাঁধ সোজা কর যেন সব সমরেখায় থাকে।
- ✓ বুকের উপরে স্টার্নামের নিম্নের অংশে (চিত্র ৫.২.ক ও চিত্র ৫.২.খ অনুসরণ কর) এই অবস্থানে এক হাতের গোড়ালি রাখো।



চিত্র ৫.২.খ: এক নজরে ১ বছরের ছোট শিশু, ১-৮ বছরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চেস্ট কম্প্রেশনের পার্থক্য

১ বছর বয়সী বা এর চেয়ে ছোট শিশুদের জন্য

- ✓ শিশুর নিপলের সাথে সংযোগকারী একটি রেখা চিত্র কল্পনা কর এবং সেই লাইনের ঠিক নীচে শিশুর স্টার্নামের উপর দুটি আঙ্গুল রাখো।
- ✓ বুক চাপতে তোমার দুটি আঙ্গুল ব্যবহার কর যেন শিশুর বুকের গভীরতার অন্তত ১ ইঞ্চি নিচে দেবে যায়।

৫.২.২ কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশনের নিয়ম:

৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য: তুমি যদি সিপিআর-এ প্রশিক্ষিত হয়ে থাক এবং তোমার দক্ষতা ব্যবহার করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ কর, তবে তুমি নিম্নোক্ত ধাপগুলো মেনে হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআর বা উদ্ধার নিঃশ্বাসসহ সিপিআর দিতে পারবে।

ক. হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআর

১। রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বস এবং তোমার বাহু এবং শরীরের অবস্থান পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে বুকের মাঝখানে স্টার্নামের নিচের অংশের উপর রাখো।

২। তোমার শরীরের ভর ব্যবহার করে একটি অবিচলিত ছন্দে নিচের দিকে চাপ দাও, যেন রোগীর বুকের খাঁচা ৫ থেকে ৬ সেমি (২ থেকে ২.৪ ইঞ্চি) নিচে দেবে যায়। তার বুক যথাযথ অবস্থানে ফিরে যেতে দাও যেন সংকোচন ও প্রসারণের একটি সাইকেল পূর্ণ হয়।

৩। অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত বা যতক্ষণ তুমি ক্লান্ত না হচ্ছ ততক্ষণ প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার এই কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর।

খ. উদ্ধার শ্বাস (Rescue Breath) সহ সিপিআর

১। ব্যক্তির মাথাটি আলতোভাবে পিছনের দিকে কাত কর এবং ২ আঙ্গুল দিয়ে চিবুকটি উপরে তোল। ব্যক্তির নাকে চিমটি দিয়ে ধর যেন নাক দিয়ে বাতাস না বের হতে পারে।

২। তার মুখের উপর তোমার মুখ এমনভাবে রাখ যেন কোনো বাতাস বের হয়ে না যেতে পারে। প্রায় ১ সেকেন্ডের জন্য তাদের মুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ফুঁ দাও। তার বুকের উঠা নামা পরীক্ষা কর। ২ টি উদ্ধার শ্বাস দাও।

১০১৩

৩। উপরের হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআরের নিয়মে প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর। প্রতি ৩০টি কম্প্রেশনের পরে উপরের নিয়মে চিত্র ৫.২.খ এর ন্যায় ২টি করে উদ্ধার শ্বাস দাও। বুকে ৩০টি কম্প্রেশন এবং ২টি রেসকিউ শ্বাসের চক্র চালিয়ে যাও যতক্ষণ না উন্নত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য আসে।



চিত্র ৫.২.গ ৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উদ্ধার শ্বাস

****বিশেষ দ্রষ্টব্য:** অসুস্থ ব্যক্তিটির COVID-19 বা কোনো সংক্রমক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তাদের মুখে এবং নাকের উপর একটি কাপড় বা তোয়ালে রেখে একটি অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত শুধুমাত্র হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআর কর।

- **শিশুদের উপর সিপিআর:** শিশুদের হার্টের সমস্যার চেয়ে তাদের শ্বাসনালী এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে Rescue Breath দিয়ে শুরু করতে হয়।

ক. ১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

১। শিশুর কপালে এক হাত রেখে, আলতোভাবে তাদের মাথা পিছনে কাত করে এবং চিবুকটি তুলে তার শ্বাসনালী খোল। তার মুখ এবং নাক থেকে কোনো দৃশ্যমান বাধা অপসারণ কর।

২। শিশুর নাকে চিমটি দিয়ে ধর যেন নাক দিয়ে বাতাস না বের হতে পারে। তার মুখের উপর তোমার মুখ এমনভাবে রাখো যেন কোনো বাতাস বের হয়ে না যেতে পারে। প্রায় ১ সেকেন্ডের জন্য তাদের মুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ফুঁ দাও। তার বুকের উঠা নামা পরীক্ষা কর। প্রথমেই ৫ টি প্রাথমিক উদ্ধার শ্বাস (Rescue Breath) দাও।

৩। তোমার বাহু এবং শরীরের অবস্থান পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে বুকের মাঝখানে স্টার্নামের নিচের অংশের উপর রাখো। তোমার শরীরের ভর ব্যবহার করে একটি অবিচলিত ছন্দে নিচের দিকে চাপ দাও, যেন রোগীর বুকের খাঁচা অন্তত ২ ইঞ্চি নিচে দেবে যায়, যা বুকের ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বুকের সংকোচনের গুণমান (গভীরতা) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এক হাত ব্যবহার করে ২ ইঞ্চি গভীরতা অর্জন করতে না পারলে ২ হাত ব্যবহার কর।

৪। উপরের হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআরের নিয়মে প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর। প্রতি ৩০টি কম্প্রেশনের পরে উপরের নিয়মে চিত্র ৫.১.ট – এর ন্যায় ২টি করে উদ্ধার শ্বাস দাও। ৩০টি বুকে কম্প্রেশন এবং ২টি উদ্ধার শ্বাসের চক্র চালিয়ে যাও যতক্ষণ না উন্নত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য আসে।



চিত্র ৫.১.ছ: ১ – ৮ বছর বয়সী শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উদ্ধার শ্বাস

খ. ১ বছরের কম বয়সী শিশু

১। শিশুর কপালে এক হাত রেখে, আলতোভাবে তাদের মাথা পিছনে কাত করে এবং চিবুকটি তুলে তার শ্বাসনালী খোল। তার মুখ এবং নাক থেকে কোনো দৃশ্যমান বাধা অপসারণ কর।

২। শিশুর নাকে চিমটি দিয়ে ধর যেন নাক দিয়ে বাতাস না বের হতে পারে। তার মুখের উপর তোমার মুখ এমনভাবে রাখো যেন কোনো বাতাস বের হয়ে না যেতে পারে। প্রায় ১ সেকেন্ডের জন্য তাদের মুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ফুঁ দাও। তার বুকের উঠা নামা পরীক্ষা কর। প্রথমেই ৫ টি প্রাথমিক উদ্ধার শ্বাস (Rescue Breath) দাও।

৩। তোমার হাতের দুই আঙ্গুলের অবস্থান পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে বুকের মাঝখানে স্টার্নামের নিচের অংশের উপর রাখো এবং অবিচলিত ছন্দে নিচের দিকে চাপ দাও, যেন রোগীর বুকের খাঁচা অন্তত ১.৫ ইঞ্চি নিচে দেবে যায়, যা বুকের ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বুকের সংকোচনের গুণমান (গভীরতা) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি দুই আঙুলের ব্যবহার করে ১.৫ ইঞ্চি গভীরতা অর্জন করতে না পারলে ১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য উল্লেখিত নিয়মে এক হাতের গোড়ালী ব্যবহার করতে পারো।

৪। উপরের হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআরের নিয়মে প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর। প্রতি ৩০টি কম্প্রেশনের পরে উপরের নিয়মে চিত্র ৫.১.ছ এর ন্যায় ২টি করে উদ্ধার শ্বাস দাও। ৩০টি বুকে কম্প্রেশন এবং ২টি উদ্ধার শ্বাসের চক্র চালিয়ে যাও যতক্ষণ না উন্নত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য আসে।

****বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

- মনে রাখতে হবে, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমেই ৫ টি উদ্ধার শ্বাস এবং পরে ৩০টি বুকে কম্প্রেশন ও ২টি উদ্ধার শ্বাসের চক্র।
- শিশুদের উপর সিপিআরের নিয়ম অনেকাংশে তাদের ওজনের উপর নির্ভর করে।

৫.৩ চোকিং (Choking)

খাদ্য, পানীয়, নকল দাঁত অথবা দুর্ঘটনাক্রমে নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া কোনো বস্তুর কারণে শ্বাসনালীর পথ আটকে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, যার কারণে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে । এই অবস্থাকে চোকিং বলা হয়। বাতাস ফুসফুসে পৌছাতে না পারলে মৃত্যুও হতে পারে।

৫.৩.১ হেইমলিখ কৌশল (Heimlich maneuver)

হেইমলিখ কৌশল (Heimlich Maneuver) হল একজন চোকিং আক্রান্ত ব্যক্তি বা শিশুকে সাহায্য করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। এই কৌশলে পিঠে ধাক্কা (Back blow), পেটে চাপ (Abdominal thrust) এবং এক বছরের ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে বুকে চাপ (Chest thrust) দেওয়া হয়। বয়স ও বিশেষ অবস্থাভেদে হেইমলিখ কৌশল ভিন্ন। হেইমলিখ কৌশল সম্পাদন করার পূর্বে তোমাকে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে তা নির্ভর করে যে তুমি কাকে সাহায্য করছো:

- একজন ব্যক্তি যিনি গর্ভবতী না বা শিশু না
- একজন গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকার ব্যক্তি
- একজন শিশু যে এক বছরের কম বয়সী
- একজন শিশু যে এক বছরের বেশি বয়সী
- নিজেকে

ক. একজন ব্যক্তি যিনি গর্ভবতী না বা শিশু না

প্রথমে আক্রান্ত ব্যক্তির পেটে চাপ দেওয়ার (Abdominal thrust) প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ কর। দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হলে, ব্যক্তিটি যদি সচেতন থাকে এবং কাশি দিতে পারে, তাহলে সে নিজেই বস্তুটিকে শ্বাসনালী থেকে বের করে দিতে সক্ষম হতে পারে। যদি ব্যক্তিটি নিম্নের অবস্থায় থাকে, তবে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু কর:

- কাশি দিতে পারছে না
- কথা বলতে বা শ্বাস নিতে অক্ষম
- সাহায্যের জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে (সাধারণত নিজের গলা হাত দিয়ে চেপে ধরে)

প্রথমত, যদি কোনো পথচারী থাকে, তাদেরকে বল জরুরি সাহায্যের জন্য স্থানীয় জরুরি ফোন নম্বরে কল করতে। তুমি যদি উপস্থিত একমাত্র ব্যক্তি হও, তবে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু কর:

১। আক্রান্ত ব্যক্তিকে দাঁড়াতে বল।

২। নিজে ব্যক্তির পিছনে গিয়ে দাঁড়াও।

৩। ব্যক্তিটিকে চিত্র ৫.৩.ক-এর ন্যায় সামনের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য কর এবং তোমার হাতের গোড়ালি দিয়ে তার পিঠে পাঁচটি আঘাত কর (Back blow)।

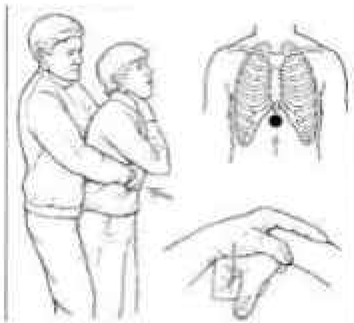
৪। তার কোমরের চারপাশে তোমার এক হাত দিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধর। হাতটি দিয়ে একটি মুষ্টি তৈরি কর এবং এটি নাভির ঠিক উপরে রাখো (বৃদ্ধাঙ্গুল ভিতরের দিকে থাকে)।

৫। চিত্র ৫.৩.খ-এর ন্যায় তোমার অন্য হাতটি দিয়ে মুঠিটি ধর এবং একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে চাপ দাও। এভাবে পর পর ৫টি চাপ (Abdominal thrust) সম্পাদন কর।

৬। বস্তুটি বের না হওয়া পর্যন্ত এই কৌশল পুনরাবৃত্তি কর এবং ব্যক্তিকে নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা কাশি দিতে উদ্বুদ্ধ কর।



চিত্র ৫.৩.ক একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হেইমলিখ কৌশলের (Heimlich maneuver) প্রক্রিয়া



চিত্র ৫.৩.খ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হেইমলিখ কৌশলের (Heimlich maneuver) হাতের অবস্থান

****বিশেষ দ্রষ্টব্য:** যদি ব্যক্তি উঠে দাঁড়াতে না পারে, শোয়া অবস্থায় তার কোমর ধরে একইভাবে মুষ্টি ভিতরের দিকে এবং উপরের দিকে চাপ দাও, যেভাবে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দিতে হতো।

খ. গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকার ব্যক্তি

গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, তোমার হাতটি তার ধড় থেকে কিঞ্চিত উঁচুতে স্টার্নামের নিচের অংশে রেখে একইভাবে মুষ্টি ভিতরের দিকে এবং উপরের দিকে চাপ দাও। যদি সেই ব্যক্তি অজ্ঞান থাকে, তবে তাদের পিঠে রাখো এবং আঙ্গুল দিয়ে শ্বাসনালী পরিষ্কার করার চেষ্টা কর। যদি বস্তুটি সরাতে না পারো, তাহলে CPR শুরু কর।



চিত্র ৫.৩.গ একজন গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকার ব্যক্তির হেইমলিখ কৌশল (Heimlich maneuver)

গ. একজন এক বছরের বেশি বয়সী শিশুর উপর

১। আক্রান্ত শিশুটিকে দাঁড়াতে বল অথবা চিত্র ৫.৩.ঘ-এর ন্যায় তুমি একটা চেয়ারে বসে শিশুটির উচ্চতা ও ভর বিবেচনায় রেখে তাকে তোমার দুই উরুর উপর উপুড় করে নাও।

২। নিজে শিশুটির পিছনে গিয়ে শিশুর উচ্চতা বিবেচনা করে হাঁটু গেড়ে বস বা দাঁড়াও।

৩। শিশুটিকে চিত্র ৫.৩.ঘ-এর ন্যায় সামনের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য কর এবং তোমার হাতের গোড়ালি দিয়ে তার পিঠে পাঁচটি আঘাত কর (Back blow)।

৪। তার কোমরের চারপাশে তোমার এক হাত দিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধর। হাতটি দিয়ে একটি মুষ্টি তৈরি কর এবং এটি নাভির ঠিক উপরে রাখো (বৃদ্ধাঙ্গুল ভিতরের দিকে থাকে)।

৫। চিত্র ৫.৩.খ-এর ন্যায় তোমার অন্য হাতটি দিয়ে মুঠিটি ধর এবং একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে চাপ দাও। এভাবে পর পর ৫টি চাপ (Abdominal thrust) দাও।

৬। বস্তুটি বের না হওয়া পর্যন্ত এই কৌশল পুনরাবৃত্তি কর এবং ব্যক্তিকে নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা কাশি দিতে উদ্বুদ্ধ কর।

ঘ. একজন এক বছরের কম বয়সী শিশুর উপর

১। চেয়ারে বস এবং চিত্র ৫.৩.ছ-এর ন্যায় তোমার উরুতে শিশুটিকে শুইয়ে নিয়ে সাবধানে তার মুখে কাছাকাছি কিছু আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখ। খেয়াল রাখবে যেন শিশুর মুখ পরীক্ষা করতে যেয়ে বস্তুটি আরো ভিতরে চলে না যায়।

২। শিশুটির উচ্চতা ও ভর বিবেচনায় রেখে চিত্র ৫.৩.ঙ বা চিত্র ৫.৩.ছ-এর ন্যায় তাকে তোমার উরুর উপর উপুড় করে নাও, যেন তার পেট হাঁটুর ভাঁজ বরাবর থাকে। তোমার বাহুর উপরে শিশুর মুখমন্ডলটি ধরে রাখো।

৩। তোমার হাতের গোড়ালি দিয়ে আলতো করে পিঠে পাঁচটি ধাক্কা দাও।



চিত্র ৫.৩.ঙ পিঠে ধাক্কা (Back blow)

৪। যদি এটি কাজ না করে, তাহলে শিশুকে উল্টিয়ে নিয়ে তোমার বাহু এবং উরু দ্বারা সাপোর্ট দিয়ে তোমার মুখোমুখি অবস্থানে নাও, যেন শিশুটির মাথা তার ট্রাঙ্কের চেয়ে নীচের অবস্থানে থাকে। তাদের স্টার্নামের নিচের অংশে রেখে দুটি আঙ্গুল রাখো এবং দ্রুত বুকে পাঁচটি চাপ দাও (চিত্র ৫.৩.চ)।

৬। এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি কর যতক্ষণ না বস্তুটি বের হয়ে যায় এবং শিশু নিজে থেকে শ্বাস নিতে পারে বা কাশি দিতে পারে।



চিত্র ৫.৩.চ বুকে চাপ (Chest thrust)

ঙ. নিজের উপর: তুমি যদি একা থাকো এবং চোকিং হয়, তবে এই পদক্ষেপগুলো অনুসরণ কর:

১। একটি মুষ্টি তৈরি কর এবং এটি তোমার নাভির ঠিক উপরে রাখো (বৃদ্ধাঙ্গুল ভিতরের দিকে থাকবে)।

২। তোমার অন্য হাত দিয়ে মুঠিটি ধর এবং একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে চাপ দাও। এভাবে পেটে পর পর ৫টি চাপ (Abdominal thrust) দাও।

৩। এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি কর যতক্ষণ না বস্তুটি বের হয়ে যায় এবং তুমি নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা কাশি দিতে পারো।

৪। এছাড়াও চিত্র ৫.৩.জ-এর ন্যায় তুমি টেবিলের কোণে বা চেয়ারের পিছনের মতো শক্ত কোনো প্রান্তে তোমার স্টার্নামের নিচের অংশ রেখে একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে ধাক্কা দাও।



চিত্র ৫.৩.জ নিজের উপর হেইমলিখ কৌশলের (Heimlich maneuver) প্রক্রিয়া

৫.৪ অন্যান্য প্রাথমিক চিকিৎসা

এছাড়াও আমাদেরকে কিছু জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রায়শই যেতে হতে পারে। তার কিছু উদাহরণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিম্নে দেওয়া হল:

৫.৪.১ রক্তপাত

ক. হাত ধুয়ে ডিসপোজেবল গ্লাভস (যদি থাকে) পরে নাও। এটি তোমাকে সংক্রমক ব্যাধি থেকে রক্ষা করবে।

খ. পানি দিয়ে ক্ষত ধুয়ে ফেলো।

গ. রক্তের প্রবাহ বন্ধ করতে একটি গজ বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সরাসরি চাপ প্রয়োগ কর এবং জমাট বাধতে সাহায্য কর (যখন রক্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘন হয়ে যায় তখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়)।

ঘ. রক্তপাত হওয়া ক্ষত অংশটি ব্যক্তির মাথার উচ্চতার উপরে উন্নীত কর।

ঙ. পেঁচিয়ে রাখা কাপড় ভিজে গেলে সরিয়ে ফেলবে না। প্রথম স্তরটি অপসারণ করলে জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করবে এবং এর ফলে আরও রক্তক্ষরণ বাড়বে। পরিবর্তে, প্রয়োজন হলে আরও স্তর যোগ কর।

চ. রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষতস্থানে একটি পরিষ্কার ব্যান্ডেজ লাগাও।

হাসপাতালে নিয়ে যাও, যদি:

- ক্ষত গভীর হয়, ক্ষত বড় হয়
- চাপ প্রয়োগ করার পর আঘাতে রক্ত বের হয়
- আঘাত একটি পশু বা মানুষের কামড় থেকে হয়
- আঘাতটি পোড়া বা বৈদ্যুতিক আঘাত
- রক্তপাত বন্ধ না হয়

৫.৪.২ দহন বা পুড়ে যাওয়া ক্ষত

ক. পোড়ার চিকিৎসার প্রথম ধাপ হল দহন প্রক্রিয়া বন্ধ করা। এর অর্থ হতে পারে:

- রাসায়নিক পদার্থ থাকলে তা পরিষ্কার করা
- বৈদ্যুতিক শকে পুড়লে বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করা
- কল ছেড়ে চলমান পানি দিয়ে ক্ষতস্থান শীতল করা
- ঢেকে রাখা বা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সূর্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া

খ. পোড়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা: অতিরিক্ত পোড়ার জন্য জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন। জরুরি নয় এমন পোড়ার জন্য, তুমি এই প্রাথমিক চিকিৎসার পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারো:

- কয়েক মিনিটের জন্য ঠান্ডা চলমান পানি দিয়ে পোড়া জায়গাটি ধুয়ে ফেলো। বরফ ব্যবহার করবে না।
- একটি হালকা গজ ব্যান্ডেজ আলতো করে ক্ষতের উপর দিয়ে দাও। যদি পোড়া সামান্য হয়, এটি ঢেকে দেওয়ার আগে পোড়ার মলম লাগাতে পারো।
- প্রয়োজন হলে ব্যথা উপশমের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথা উপশমের ওষুধ দিবে।
- কোনো ফোস্কা হলে তা ফুটা করবে না।

৫.৪.৩ নাক দিয়ে রক্তপাত: নাক দিয়ে রক্তপাতের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল ট্রমা। রক্তাক্ত নাকের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে:শুষ্ক বা গরম বাতাস, উচ্চ উচ্চতা, রাসায়নিক ধোঁয়া, সর্দি এবং এলার্জি, নাকে ট্রমা, বিচ্যুত সেপ্টাম (বাকা নাকের তরুণাস্থি), অনুনাসিক পলিপ বা নাকের টিউমার, রক্তপাতের ব্যাধি (যেমন, হিমোফিলিয়া এবং লিউকেমিয়া), উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভাবস্থা, অনুনাসিক স্প্রে, ডিকনজেস্ট্যান্ট এবং অ্যান্টিহিস্টামিনের ঘন ঘন ব্যবহার, NSAIDs, রক্ত পাতলাকারী (যেমন ওয়ারফারিন), কোকেন এবং অন্যান্য ওষুধ। এই জিনিসগুলোর মধ্যে অনেকগুলো তোমার নাকের সূক্ষ্ম ঝিল্লি শুকিয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যার ফলে সেগুলো খসখসে হয়ে যায় এবং ফেটে যায়।

তোমার নাক দিয়ে রক্তপাত হলে:

- একটু সামনে ঝুঁকো, পিছনে না।
- নাকের ব্রিজের ঠিক নীচে নাক চাপ দিয়ে ধরো।
- পাঁচ মিনিট পর দেখে নাও যে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে কিনা। যদি না হয়, নাক চাপ দিয়ে ধরে থাকো এবং আরও ১০ মিনিট পরীক্ষা কর।
- নাকের ব্রিজে একটি ঠাণ্ডা প্যাক প্রয়োগ কর।

উন্নত চিকিৎসা নিতে হবে যদি:

- ঘন ঘন নাক দিয়ে রক্তপাত হয়
- রক্ত স্বল্পতার লক্ষণ থাকে (যেমন, দুর্বলতা, অজ্ঞানতা, ক্লান্তি এবং ফ্যাকাশে ত্বক)
- রক্ত পাতলা করার ওষুধ সেবন করলে
- রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্তপাতের ব্যাধি থাকলে
- অস্বাভাবিক ক্ষত থাকলে; প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে
- শ্বাস নিতে কষ্ট হলে
- মাথায় গুরুতর আঘাত পেলে

জব-১: ৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক / ১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের / ১ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন (CPR- Cardiopulmonary resuscitation)

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৩	হ্যান্ড গ্লোভ্স	রাবারের তৈরি	০১ জোড়া

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন): জব অনুযায়ী যদি প্রয়োজন হয়।

কাজের ধারা

ধাপ-১ পারিপার্শ্বিক বিপদচিহ্ন **(Danger)** লক্ষ্য কর। আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থান ও স্থান এবং তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত কর।

ধাপ-২ রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা **(Response)** নিশ্চিত কর। রোগী তোমার ডাকে সাড়া দিলে তাকে তার অবস্থানে থাকতে দাও ও তার কি সমস্যা হয়েছিল তা জানার চেষ্ট কর। প্রয়োজনে সাহায্য নাও। রোগী তোমার ডাকে সাড়া না দিলে পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৩ রোগীর শ্বাসনালী **(Airway)** পর্যবেক্ষণ কর। শ্বাসনালীতে কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করতে রোগীর মুখ খুলে দেখ এবং যদি থাকে তা বের করার জন্য মাথা একপাশে ঘুরিয়ে দাও। যদি কিছু বের না হয়, তাহলে রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখার জন্য পুনরায় পরীক্ষা কর।

ধাপ-৪ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস **(Breathing)** পরীক্ষা কর।

ধাপ-৫ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ভালো থাকলে তাকে পুনরুদ্ধার অবস্থানে (Recovery position) নিয়ে আসো। যদি রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস না নেয়, তবে নিকটস্থ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা কর, বা ৯৯৯ এ কল করে সাহায্যের জন্য আবেদন কর। অবিলম্বে তার উপর CPR শুরু কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করে মলি প্রিপারশন পদ্ধতি ও খাবার পরবিশেন দেখাতে পারবে।
ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব-২: প্রাপ্তবয়স্ক / ১ বছরের বেশি বয়সী শিশু / ১ বছরের কম বয়সী শিশু / গর্ভবতী মহিলার জন্য চোকিং-এর প্রাথমিক চিকিৎসা

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বিএলএস বলতে কি বোঝায়?
২। একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সিপিআরের সঠিক অনুপাত কী?
৩। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য বুকের সংকোচনের সঠিক হার কত?
৪। একটি শিশুর বুকে কম্প্রেশনের জন্য অবস্থান কি হবে?
৫। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বুকের সংকোচনের সঠিক গভীরতা কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কিভাবে শিশুদের উদ্ধারের শ্বাস দেওয়া হয়?

২। ১ বছরের ছোট শিশু, ১-৮ বছরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চেস্ট কম্প্রেশনের পার্থক্য কি?

৩। DR-AB বলতে কি বুঝ ?

৪। চেইন অফ সারভাইভালো বলতে কি বুঝো?

৫। কোনো কোনো অবস্থায় চোকিং-এর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রিকভারী পজিশন সম্পর্কে লিখ।

২। নাক দিয়ে রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা উল্লেখ কর।

৩। একজন এক বছরের কম বয়সী শিশুর উপর হেইমলিখ কৌশল (Heimlich maneuver) লিখ।

৪। টিকা: সিপিআর

৫। টিকা: DR-AB

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।